৯

পল্লী উন্নয়ন
Rural Development

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন যাদের জীবিকা কৃষি থেকে আসে। কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত। কিন্তু দেখা যায় যে কৃষিতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় না। গ্রামীণ সমাজে শ্রেণী পৃথকীকরণের ফলে ধনী কৃষকগণের হাতে জমি ও উদ্বৃত্ত পুঞ্জীভূত হয়। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হয় না। সে কারণে গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি খাতে কর্মসংস্থান হয় না। অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলে বাজার বিস্তৃত হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রামের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকগণ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এসকল মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থা নেই অধিকাংশ মানুষের। সরকারী উদ্যোগে দারিদ্র বিমোচনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী যেমন পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, সমবায় ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে আধিপত্যশীল ধনী শ্রেণী এসকল কর্মসূচীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে বিত্তশালীদের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কুক্ষীগত হয়ে যায়। পল্লী উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থাসমূহের আগ্রহ লক্ষণীয়। বেসরকারী সাহায্য সংস্থাসমূহ নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে, বিশেষত দরিদ্র নারীকে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। এসকল বেসরকারী সাহায্য সংস্থার ঋণদান ও সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী অল্পসংখ্যক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটিয়েছে। কিন্তু এনজিও কার্যক্রম সার্বিক অর্থে গ্রামীণ দারিদ্র কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্ক বদলের ক্ষেত্রেও পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রভাব পড়েনি।

এই ইউনিটের পাঠগুলি হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : গ্রামীণ সমাজ ও দারিদ্রের স্বরূপ
- পাঠ - ২ : পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল
- পাঠ - ৩ : পল্লী উন্নয়নে সরকারী পরিকল্পনা
- পাঠ - ৪ : পল্লী উন্নয়নে এনজিও মডেল : ব্র্যাক
- পাঠ - ৫ : ক্ষুদ্র ঋণ মডেল : গ্রামীণ ব্যাংক

পাঠ - ১

গ্রামীণ সমাজ ও দারিদ্রের স্বরূপ
Rural Society and the Face of Poverty

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা
- মজুরী শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা
- কৃষকের দারিদ্র মোকাবেলার সংগ্রাম

সম্পদের অসম বণ্টন

কৃষি অর্থনীতিতে কৃষিভূমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক নির্ধারণ করে সম্পদের মালিকানা ও সম্পদের বন্টন। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কেবল ৫% ধনী কৃষক এবং ২০% মাঝারি কৃষক কৃষিযোগ্য জমির প্রায় ৮০% এর মালিক। ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তাদের জমির পরিমাণ অনেক কম। এ কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের শ্রম উদ্বৃত্ত অনেক বেশি। এসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণই ধনী ও মাঝারি কৃষকদের অধিকাংশের জমি চাষ করে থাকেন। সামাজিক মর্যাদা বোধের কারণে এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ধনী ও অল্প সংখ্যক মাঝারি কৃষক বর্গাচাষে আগ্রহী হন। তাছাড়া জমি বর্গাচাষে দেবার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। তবে গ্রামের একটি বড় অংশ আছে যারা ভূমির মালিক নয়। এই ভূমিহীনতাই সরাসরি দারিদ্র, নিরপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা ও ঋণগ্রস্ত হয়ে নিঃস্বকরণের প্রধান কারণ। ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমিতে ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে সীমিত আয়ের মজুরীই তাদের প্রধান বাঁচায় উপায়।

কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা

কৃষিতে যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। বর্গাচাষী ও ক্ষুদ্র চাষীর পুঁজির যোগান কম। ধণী চাষীদের পুঁজি থাকলেও তারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেন না।

কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এবং তা সুষমভাবে বন্টন হলে সকল শ্রেণীর পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব। কিন্তু দেখা যায় যে কৃষকের উপর নির্ভর করে বলে বর্গাচাষী অনিরাপত্তায় ভোগেন। বর্গাচাষ করতে পারলে দেখা যায় ফসলের বন্টন বর্গাচাষীর অনুকূলে নয়। ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হয়। কিন্তু বর্গাচাষীকে বহন করতে হয় উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয়ভার। বর্গাচাষীকে লাঙ্গল, গরু থেকে শুরু করে বীজ, সার, সেচের জন্য পানির বাড়তি মূল্য, কীটনাশক সবকিছু যোগাড় করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অনিরাপত্তা ছাড়াও কৃষি উপকরণ সময়মত যোগাড় করার ঝুঁকি অনেক। এরপর আছে পুঁজির যোগান। প্রয়োজনীয় ঋণ সরকারী ঋণ দান কর্মসূচী ও ব্যাংক থেকে পাওয়া যায় না। কারণ বর্গার জমি জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অতিমাত্রায় খরচাপাতি যোগাড় করে মজুরী শ্রম খাটিয়ে বর্গাচাষী কৃষিতে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ করতে অপারগ হন। অনেক বর্গাচাষী চেষ্টা করেন অধিক পরিমাণ জমি বর্গা নিয়ে অল্প ব্যয়ে চাষ করতে। কিংবা কিছু জমি বর্গা নিয়ে বর্গাচাষী অন্যের জমিতে মজুরী শ্রম খাটতেও আগ্রহী হন। এসকল কারণে বর্গাচাষের ব্যবস্থায় কৃষিতে উৎপাদন দারুন ব্যাহত হয়।

গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুরে সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি প যাদের আয়ের একমাত্র কৃষি উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগ। মজুরী শ্রমে চাহিদার তুলনায় মজুর শ্রমিকের সংখ্যা বেশী মজুরী পরিমাণ কমে য

ধনী কৃষকগণের পুঁজি থাকলেও এবং ঋণগ্রহণের সুযোগ থাকলেও তারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সে অর্থ বিনিয়োগ করেন না। দেখা যায় যে ধনী কৃষকগণ সরকারী ব্যাংক থেকে ভূয়া সার্টিফিকেট দিয়ে প্রচুর অর্থ ঋণ হিসেবে লাভ করেন। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল চাষাবাদের দরুন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও তাদের লাভ হয়। কিন্তু ধনী শ্রেণীর কৃষক উদ্বৃত্ত সম্পদ সর্বাধিক ব্যয় করেন জমি ক্রয় বাবদ। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গৃহ নির্মাণ, ভোগবিলাসেও তারা পুঁজি বিনিয়োগ করেন। গ্রামাঞ্চলে উন্নত চাষাবাদের প্রযুক্তি স্থানান্তর হওয়ায় সেচ, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তাদের জন্য ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত আয়ের দরুন সম্পদশালী হিসেবে ধনী শ্রেণীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের

প্রশাসনের স্থানীয় কাঠামোর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে আরো ক্ষমতা এবং আরো সম্পদ বৃদ্ধির দিকে তারা বেশি ঝুঁকে পড়েন। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রান্তিক চাষী যাদের অল্প জমি আছে তাদের পক্ষে উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এই সুযোগে ক্ষমতাশীল ধনী কৃষকগণ তাদের দাপট দেখিয়ে এবং নানা কলহ ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে প্রান্তিক চাষীদের জমি ক্রয় করেন। এভাবেই প্রান্তিক চাষীরা ক্রমাগত শেষ সম্বল এক টুকরো জমি হারিয়ে ভূমিহীনের দলভুক্ত হন। এছাড়া যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির কারণে ক্ষুদ্র কৃষক জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হন। ধনী কৃষকগণ অনেক সময় বর্গাচাষ বন্ধ করে শ্রমিক নিয়োগ করে জমি চাষের সিদ্ধান্ত নেন। এ ক্ষেত্রে বর্গাচাষী হয়ে যান ভূমিহীন বা ক্ষুদ্র চাষী যাকে বেঁচে থাকার জন্য মজুরী আয় অন্বেষণ করতে হয়। ধনী কৃষক যদি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চাষাবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে কৃষি উপকরণের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি উপকরণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ক্রয় সীমার বাইরে চলে যায়।

কর্মসংস্থানের অভাব

গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে অধিকাংশ মানুষ মজুরী শ্রমের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু গ্রামে শ্রম বাজার বিস্তৃত নয়। সর্বাধিক কর্মসংস্থান হয় কৃষিতে। বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যাদের আয়ের একমাত্র উৎস কৃষি উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে গ্রামের ধনী কৃষকগণের অধীনে সর্বাধিক জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ধনী কৃষকগণই বড় চাকুরীদাতা। গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোতে ধনী কৃষকগণ আধিপত্য বিস্তার করেন সর্বক্ষেত্রে। শ্রম বাজারেও সৃষ্টি হয় ক্ষমতাশীল ধনী কৃষকের আধিপত্য। কেবল কর্মসংস্থানকারী হিসেবে নয়, কর্মের শর্ত এবং মজুরীর উপরও তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ নিজেদের শ্রম ও পারিবারিক পরিশ্রমের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকেন। এ শ্রেণীর অল্পসংখ্যক কৃষক অ-কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদের কৃষি কাজে মজুরী শ্রমের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়।

ধনী কৃষকগণ লাভজনক অ-কৃষি কাজে অধিক নিয়োজিত থাকায় তাদের জমিতে মজুরী শ্রমের প্রয়োজন সর্বাধিক। মজুরী শ্রমের চাহিদার তুলনায় মজুরী শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় মজুরীর পরিমাণ কমে যায়। তাছাড়া কৃষি অর্থনীতিতে সারা বৎসর শ্রমের চাহিদা থাকে না। বৎসরে কয়েক মাস বিশেষত বর্ষাকালে কোন কাজ থাকে না। ক্ষেত মজুরগণ কোন উপায় না থাকায় স্বল্প মজুরীতে এবং অনেক সময় কেবল পেটে ভাতে মালিকের জমিতে কাজ করতে রাজী থাকেন। এভাবে তাদের প্রকৃত আয় অনেক কমে যায়। গ্রামে বেকারত্ব বা একেবারে কোন কাজ করছেন না, এমন অবস্থা দৃশ্যমান হয় না। কারণ সহায় সম্বলহীন মানুষ অত্যধিক শোষণমূলক হলেও এবং অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে হলেও কোন না কোন কাজ খুঁজে নেন। তা না হলে পরিবার পরিজন নিয়ে উপোস কারা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ কারণে তাদের পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ কমতে থাকে এবং কর্মশক্তি লোপ পায়। ছদ্ম বেকারত্বের পরিমাণ বেশী। কারণ কৃষি হয়ে গেছে অত্যধিক শ্রমঘন। এর পরও সর্বহারার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে সর্বাহারাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। গ্রামে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় অ-কৃষি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না। অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলে বাজার বিস্তৃত হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণেরও প্রকৃত আয় কমে যায় বলে তারাও দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এসকল প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মত অবস্থা নেই অধিকাংশ মানুষের। তার মানে দারিদ্রসীমার নীচে অধিকাংশ মানুষের অবস্থান।

কৃষকের দারিদ্র মোকাবেলার সংগ্রাম

পূর্বে দরিদ্র পরিবার গুলি প্রকৃতি থেকে অনেক কিছু বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারতো। এখন তা সম্ভব হয় না।

দারিদ্রের বিপরীতে চলে কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বেঁচে থাকার জন্য অনবরত তারা নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। অ-কৃষি খাত বিকাশ লাভ না করায় ও শিল্পোন্নয়ন না হওয়ায় কর্মসংস্থানের সংগ্রাম অনেক কঠিন। তারা মাছ ধরা, তাঁত বা অন্য কোন সনাতন শিল্পকর্ম ও দোকানপাট, পরিবহন ইত্যাদিতে কাজের সন্ধান করেন। অল্প পুঁজি তৈরী হলে গরুর বাছুর এনে লালন পালন করেন। এটি বড় হলে তার দুধ বিক্রয় করতে পারেন। গরুর বাচ্চা হলেও বিক্রয় করতে পারেন। অনেক সময় ধনী কৃষকগণ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গরু পালনে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা আয় রোজগারে বড় ভূমিকা রাখে। দরিদ্র পরিবারের ছয় বৎসর বয়স্ক শিশু, কখনো বেকার থাকে না। চৌদ্দ বৎসর হলে দরিদ্র শিশু যা ভোগ করে তা নিজেই রোজগার করে। অনেক সময় ধনী কৃষকের পরিবারে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে পেটেভাতে শিশুরা কাজ করে। এছাড়া লাকড়ী সংগ্রহ, শাকপাতা সংগ্রহ, মাছ ধরা এসব কাজে নিয়োজিত থেকে পরিবারে খাদ্যোৎপাদনে তারা সাহায্য করে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে ডোবা নালা ও ধানক্ষেতের জমানো পানিতে মাছ হয় না। লতাগুল্মও জন্মায় না পূর্বের মত। দরিদ্র পরিবারের নারীরা গৃহস্থালীর কাজের বাইরে আয়ের জন্য ধনী পরিবার গুলিতে কাজ করেন। পূর্বে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ প্রচুর ছিল। কিন্তু এখন সে কাজ না থাকায় গৃহস্থালীর কাজ, পাট ছাড়ানো ইত্যাদি শস্য প্রক্রিয়াজাত করণের কাজে নারীরা নিয়োজিত হন। অধিকাংশ কাজ মৌসুমী কাজ। সারা বছর থাকে না। নারীর শ্রম সস্তা হওয়ায় অনেকে কেবল খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করেন। নিজেদের গৃহস্থালীর জন্য লাকড়ী সংগ্রহ, খাদ্য সাহায্য সংগ্রহ ইত্যাদিতে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া ধান কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা ধান সংগ্রহ, গোবর সংগ্রহ করে জ্বালানী তৈরী করার কাজ করেন। গৃহস্থালীর অভাব মেটানোর জন্য নারীরা গ্রামের পরিচিত বাড়ী থেকে খাবার, লবন, তেল, কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদি সাহায্য সংগ্রহ করেন। জ্বালানী ও খাদ্য সংগ্রহে শিশুরা নিয়োজিত থাকে। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ করে।

জরুরী অবস্থায় কিংবা গৃহস্থালীর কোন সদস্য অসুস্থ হলে দরিদ্র কৃষক পরিবার গৃহস্থালী সামগ্রী বিক্রয় করে দেন। দরিদ্র পরিবারে স্বর্ণালঙ্কার না থাকায় জামানত দেবার মত কিছু থাকে না বলে ঋণ পাওয়া সহজ হয় না। ঘরে তামা কাঁসার কোন তৈজসপত্র, কাঠের জিনিস বা মূল্যবান কিছু থাকলে তা বিক্রয় করেন। ঘরের চাল টিনের হলে সে টিন বিক্রয় করেন। সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে যে ঘর এবং ভিটেমাটি থাকে তাও বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে আশ্রয়হীন হয়ে যান।

দরিদ্রের অবস্থায় টিকে থাকার জন্য প্রতি দিন চলে খাদ্য সংকোচন নীতি।

দারিদ্রের অবস্থায় টিকে থাকার জন্য প্রতিদিন চলে খাদ্য গ্রহণে সংকোচন নীতি। খাদ্য তালিকায় মুখ্য হচ্ছে চাল। কোন উপায়ে চাল ক্রয় করতে পারলে গ্রাম থেকে শাকপাতা যোগাড় করে, মাছ ধরে কিংবা লবন দিয়ে ভাত খাবার যোগাড় করেন। আরো খারাপ অবস্থায় চাল খাওয়াও ছেড়ে দেন। গম খাওয়ার অভ্যাস করেন যেহেতু গমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। গ্রাম থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করা দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে নদী থেকে মাছ ধরে জীবনধারণ করা যেত। এখন নদীগুলি ইজারা দিয়ে দেয়ায় সে সুযোগ নেই। খাদ্যাভ্যাস বদলের ক্ষেত্রে এবং কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে গৃহস্থালীর নারীদের দায়িত্ব অধিক।

দারিদ্রের কারণে পরিবার, গোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়। দীর্ঘদিন দারিদ্রের কারণে অপুষ্টিতে ভোগার ফলে কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। তখন জীবন ধারণের জন্য চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি ও যৌন ব্যবসায়ের সঙ্গে অনেকে যুক্ত হয়ে পড়েন। দারিদ্রের কারণে পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পায়। শিশুদের উপর চলে নির্যাতন। অত্যধিক নিপীড়নমূলক অবস্থায় পরিবার ভেঙ্গে যায়। অধিকাংশ সময় স্ত্রীকে বাড়ী থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়। অসহায় নারী তখন সর্বহারা হয়ে পিতামাতার দরিদ্র পরিবারেও ঠাঁই পান না।

দারিদ্রের অবস্থায় বাঁচার তাগিদে সর্বহারা মানুষ ধনী কৃষকদের কাছে বারংবার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন। কাজের জন্য ও মজুরী বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। ধনী কৃষকদের ন্যায়বিচার বোধ ও নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় ধনী কৃষকগণ অনেক সময় দরিদ্র মানুষজনকে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। অর্থনৈতিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে গ্রামীণ কোন্দল, দলাদলি এমনকি মারামারিতে পর্যন্ত ক্ষমতাশালীরা দরিদ্র মানুষকে ব্যবহার করেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোন উপায়ে বাঁচার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে দরিদ্র মানুষজন অন্য গ্রামে কাজের সন্ধানে বের হন। একান্ত নিরুপায় হয়ে দরিদ্র মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিবাসন করেন।

কেস স্টাডি : ১

জ্বালানী ও পানি সঙ্কট : নারীর কাজ ও সময়ের উপর প্রভাব

বেড়া গ্রামটি কেরানীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ঢাকা থেকে এটি ১৮ মাইল দূরে। ঢাকার এত সন্নিকটে হলেও এখানে গ্যাস সরবরাহ পৌঁছেনি। গ্রামের জনসংখ্যার ১% উচ্চবিত্ত, ১৪% মধ্যবিত্ত, ১৯% নিম্নবিত্ত এবং ৬৬% দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য প্রস্তুত করা নারীদের কাজ। গৃহস্থালী কাজের একটি বড় অংশ হচ্ছে জ্বালানী ও পানি সংগ্রহ করা। দরিদ্র পরিবারগুলি এ দুটোই প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করেন। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর বন জঙ্গল থাকায় জ্বালানী সংগ্রহ এতটা কষ্টকর ছিল না। নদী, পুকুর ইত্যাদির পানি ভালো থাকায় কাছাকাছি উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু পরিবেশ দূষণের কারণে পানি দূষিত হয়ে গেছে। বনজঙ্গলও উজাড় হয়ে গেছে। ফলে দরিদ্র পরিবারগুলিকে জ্বালানী ও পানি সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জ্বালানী হিসেবে যে কাঠ বাজারে পাওয়া যায় যা তা কেবল স্বচ্ছল কৃষকগণই ক্রয় করতে পারেন। ধনী কৃষকের নিজস্ব টিউবওয়েল থাকায় তাদের পানি সঙ্কটও কম।

জ্বালানী ও পানি সংগ্রহের জন্য দরিদ্র পরিবারের নারীদের প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়।

জ্বালানী হিসেবে এগ্রামে ব্যবহৃত হয় কাঠ, খড়, টেগর (শুকনা কচুরীপানা), শুকনা পাতা, গাইথা (শুকনা গোবর), মইথা (চারকল), ধইঞ্চা (একধরনের ছোট গাছ), গাছের ডাল, কেরোসিন, টিগল (শুকনা বুনো ফল)ও গটখুল (শুকনা বুনো বাদাম জাতীয়)। পূর্বে ধনী কৃষকদের বাড়ী থেকে জঙ্গলের গাছের ডালপালা, খড় ও গোবর বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু এখন সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তা সম্ভব হয় না। ধনী কৃষকগণও জ্বালানীর জন্য খড় ব্যবহার করেন এবং গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করেন। দরিদ্র পরিবার গুলি বেশি ব্যবহার করেন খড়, শুকনো কচুরী পানা, পাতা, ফল, বাদাম ইত্যাদি। এর সবকিছু নারীদের সংগ্রহ করতে হয় দূরবর্তী স্থান থেকে। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করার ফলে ধান গাছ লম্বা হয় না। সে কারণে খড় পাওয়া যায় না। আবার বর্ষাকালে এ ধরনের জ্বালানীর উপর নির্ভর করা যায় না। তাছাড়া এ ধরনের জ্বালানীর আগুন বেশীক্ষণ থাকে না বলে রান্নার সময় পুরোটাই নারীদের চুলার কাছে বসে থাকতে হয়।

পানি সংগ্রহের জন্য দরিদ্র নারীদের প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। কারণ খাওয়া, ধোয়ামোছা, গোসল প্রভৃতির জন্য গৃহস্থালীতে প্রচুর পানি দরকার হয়। নিজেদের টিউবওয়েল না থাকায় ধনী কৃষকদের ব্যক্তিগত টিউবওয়েল থেকে কিংবা সরকারী টিউবওয়েল থেকে পানি সংগৃহীত হয়। সরকারী টিউবওয়েলের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় অধিকাংশ সময় সেগুলি নষ্ট থাকে। সেক্ষেত্রে পানি সংগ্রহের জন্য নারীরা সেসকল ধনী কৃষকের বাড়ীতে যেতে পারেন যাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে। সে কারণে অনেক সময় বহুদূর থেকে তারা পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হন।

নিম্নের সারণী থেকে আপনারা গৃহস্থালী কাজে নারীর সময় বন্টনের বিষয়ে জানতে পারবেন।

সারণী - ১ : গৃহস্থালী কাজে নারীর শ্রম বন্টন

কাজের ধরন	**বন্টনকৃত সময়**				
	১ ঘন্টা	২-৩ ঘন্টা	৪-৫ ঘন্টা	৬ ঘন্টার বেশী	সর্বমোট সংখ্যা
রান্না	৫%	৯১%	৫%	.৫০%	২০০
বাচ্চা লালনপালন ও পরিবারের সদস্যগণের দেখাশোনা	৫৪%	৪২%	৩%	১%	১৮২
গৃহস্থালী পরিষ্কার	৮৪%	১৬%			১৯৬
কাপড় ধোয়া	৭৩%	২৭%			১৮৭
বাড়ীর বাগান	৮০%	২০%			১২৮
পানি সংগ্রহ	৬৪%	২১%	১৫%		১৫৩
জ্বালানী সংগ্রহ	৬১%	৩৯%			১৪০
হাঁস মুরগী পালন	৮০%	২০%			১২৩
গবাদী পশু পালন	৮৩%	১৪%	৩%		২৯
ধান ও অন্যান্য শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	১৪%	৩২%	৪৩%	১১%	৩৭

উৎস : ইশরাত শামিম ও খালেদা সালাহউদ্দিন, *Energy and Water Crisis in Rural Households : Linkages With Women's Work and Time*, Women for Women, Dhaka, 1994.

দেখা যায় যে, রান্না, পান করা, গোসল, কাপড় কাঁচা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নারীদের প্রচুর পানি সংগ্রহ করতে হয় যেজন্য প্রচুর সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া জ্বালানী সংগ্রহের জন্যও প্রতিদিন অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। সে স্থলে নারীদের জন্য নিরাপদ পানি ও গ্যাসের সরবরাহ করা হলে দরিদ্র নারীদের পক্ষে উৎপাদনশীল কাজে যোগদান সম্ভব হবে।

সারাংশ

গ্রামে উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি নির্ভর। কৃষকরা প্রধানত ক্ষুদ্র জোতে নিজেদের খোরাকী যোগাড়ের জন্য চাষাবাদ করেন। দারিদ্রের চাপে ও ঋণগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ভূমি হারাচ্ছেন। ভূমিহীনের সংখ্যাই বেশি। তারা বর্গাচাষ করে ও ক্ষেতমজুর হিসেবে আয় রোজগার করেন। গ্রামে অকৃষি কর্মসংস্থান খুব কম। ফলে ক্ষেতমজুরদের কৃষির সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হয়। কৃষি কাজ শ্রমঘণ হওয়ায় মজুরী কম। দারিদ্রের অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে সর্বহারা মানুষ বাঁচার কৌশল খুঁজেন। পূর্বে দরিদ্র মানুষজন প্রকৃতি থেকে অনেক কিছু বিনামূল্যে লাভ করতেন। বর্তমানে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মাছ, শাকপাতা, লতাগুল্ম জন্মায় না পূর্বের মত। এজমালি সম্পত্তি ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে পড়ছে। পানিও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। জ্বালানী সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। ভূমিহীন দরিদ্র মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে বাজারের উপর। বাজারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ভূমিহীন কর্মহীন দরিদ্র নারী পুরুষ শিশু চরম দারিদ্রের মোকাবেলা করার জন্য বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১। বর্গাচাষ কোন শ্রেণীর কৃষকের জন্য সর্বাধিক লাভজনক?
ক. ধনী কৃষক
খ. মাঝারী কৃষক
গ. প্রান্তিক কৃষক
ঘ. বর্গাদার

২। ডিপ টিউবওয়েলের পানি কারা নিয়ন্ত্রণ করেন?
ক. স্থানীয় প্রশাসক
খ. ভূমিহীন সমিতি
গ. সমবায়ে কর্তৃত্বশীল ধনী কৃষক
ঘ. আন্দোলনের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষক

৩। গ্রামে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমের মজুরী কেন কমে যাচ্ছে?
ক. কৃষি শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কম হওয়ায়
খ. কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায়
গ. কৃষিতে শ্রমিকের সরবরাহ কমে যাওয়ায়
ঘ. ধনী কৃষকের সংখ্যা কম হওয়ায়

৪। বর্তমানে খড় কেন কম পাওয়া যায়?
ক. ধান ক্ষেতে খড় নষ্ট হয়ে যায় তাই
খ. গ্রামাঞ্চলে খড়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে
গ. উচ্চফলনশীল বীজে চাষ করলে ধান গাছ লম্বা হয় তাই
ঘ. উচ্চফলনশীল বীজে চাষ করলে ধানের গাছ বেটে হয় তাই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গ্রামের শিশুরা দারিদ্র মোকাবেলার জন্য কি কি কাজ করে থাকে?
২। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র বৃদ্ধির কারণ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দারিদ্র মোকাবেলার জন্য দরিদ্র কৃষকের সংগ্রামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন?
২। গ্রামাঞ্চলে জ্বালানী ও পানি সঙ্কট দরিদ্র নারীর কাজ ও সময়ের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে? আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল
Comilla Model for Rural Development

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- পল্লী উন্নয়নে পরিবর্তনশীল দর্শন
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD) এর কুমিল্লা এ্যপ্রোচ
- সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) বা কুমিল্লা মডেল
- কুমিল্লা মডেল অনুসারে গঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)

বাংলদেশে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বরং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করে, তার অনুসরণে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী সাজানো হয়। এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ - ১৯৫৫ সময়কালে আমদানীর বিকল্পের উপর জোর দেয়া হয়েছিল। ১৯৬০ - ১৯৬৫ সময়কালে রপ্তানী বৃদ্ধি গুরুত্ব পায়। ১৯৬৬ - ১৯৬৭ সালে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭- ১৯৬৮ সালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বড় শ্লোগানে পরিণত হয়। ১৯৭১ - ১৯৭৫ সময়কালে বন্টনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। ৮০ এর দশকে দারিদ্র বিমোচন প্রধান কর্মসূচীতে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা ড: আখতার হামিদ খান। তখন থেকে এই একাডেমিতে পল্লী উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়।

কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ

কুমিল- া একাডেমি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যোৎপাদনে বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলে।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কুমিল্লা একাডেমি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কার্যত খাদ্যোৎপাদনে বিপ্লব ঘটানো প্রধান বিষয় হিসেবে স্থির করে। এই লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে সমবায় ব্যবস্থাকে ধার্য করা হয়। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখিত হলো।

এক. গ্রামের কৃষকদের নিয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক স্তরের সমবায় সমিতির নাম কৃষক সমবায় সমিতি (KSS) যা গ্রাম পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় স্তরের সমবায় সমিতির নাম থানা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ এসোসিয়েশন (TCCA) যা থানা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। KSS এর সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করে পুঁজি সৃষ্টি করেন। KSS যৌথভাবে উৎপাদন পরিকল্পনা করে। উৎপাদনের জন্য ৫০-১০০ একর জমির ব- ক তৈরী করা হয়। এর মাধ্যমে কৃষি উপকরণ যেমন ঋণের সুবিধা বন্টনের ব্যবস্থা হয়। KSS গুলি TCCA থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে কৃষকদের ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে উচ্চ ফলনশীল ধান (HYV) ও গম চাষের বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

দুই. থানা পর্যায়ে একটি ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে KSS এর চেয়ারম্যান ও মডেল কৃষকদেরকে কৃষির নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তিন. গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচী বা রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম (RWP) গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ যাতে দরিদ্র কৃষকদের কর্মসংস্থান হয়।

চার. থানা পর্যায়ে একটি থানা ইরিগেশন প্রোগ্রাম (TIP) নেয়া হয়। এর মাধ্যমে কৃষকগণ যেন সঠিকভাবে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পাঁচ. ভূমিহীন কৃষক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, যার ফলে অ-কৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা যায়। এই সমবায়ও থানা পর্যায়ের TCCA এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

কুমিল্লা এ্যাপ্রোচটি পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রয়োগ করা হয় কুমিল্লার কোতায়ালি থানায় এবং পরে সমগ্র কুমিল্লা জেলায়। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচটি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সাফল্য অর্জিত হয়। এর পেছনে ড: আখতার হামিদ খানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ সহযোগিতা বড় কারণ। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে প্রয়োগকৃত নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থানের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়। তাছাড়া কুমিল্লা এ্যাপ্রোচের ফলে গ্রাম পর্যায়ে পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটে।

পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সমবায় সমিতি গুলিতে ধনীকৃষক, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নের পর প্রথমে গ্রামের ধনী কৃষকগণ এতে যোগদানে উৎসাহ দেখান নি। প্রথমে মধ্যম শ্রেণীর কৃষকগণ এগিয়ে আসেন। সমবায়ের মাধ্যমে বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মধ্যম শ্রেণীর কৃষকগণ উপকৃত হন এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে শুরু করেন। এই সাফল্য গ্রামের ধনীকৃষকগণকে সমবায়ে যোগদানে আকৃষ্ট করে। গ্রামের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বড় কৃষক, মহাজন, ব্যবসায়ীরা সমবায়ে যোগদান করে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। সমবায় ব্যবস্থাপনা নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও দেখা যায় যে ধনী কৃষকগণই নির্বাচিত হন ক্ষমতার জোরে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন কৃষকগণ নানাভাবে তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে থাকেন। যেমন তারা সারের ডিলারশিপ পান, ঋণের টাকা আত্মসাৎ করেন। ধীরে ধীরে সমবায়গুলি "ধনী কৃষকদের ক্লাব" অথবা "Closed Clubs of Kulaks" এ পরিণত হয়।

এমতাবস্থায় কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ নিম্নে উল্লেখিত কারণে ব্যর্থ হয়।

- সমবায় ব্যবস্থাপনা ধনী কৃষকদের আধিপত্য সৃষ্টি করে।
- গ্রামের সম্পদশালী ও ক্ষমাতবানগণ অধিক লাভবান হন।
- মাঝারি ও ছোট কৃষকগণ স্বল্প পরিমাণ লাভবান হন।
- দরিদ্র কৃষক বঞ্চিত হন।
- ধনী কৃষকের লাভ থেকে চুইয়ে চুইয়ে (trickle down) সুযোগ সুবিধা দরিদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছাবে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল, তা একেবারেই ঘটে নি।
- ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পায়।
- ধনী কৃষকদের হাতে ভূমির কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পায়।
- দরিদ্র কৃষকগণের কিছু কর্মসংস্থান হলেও তাদের প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায় নি।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন (Integrated Rural Development) বা IRDP

গ্রাম, উইনিয়ন ও থানা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী সমন্বিত করা হয়। ভূমিহীনদের সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু IRDP-তে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বেড়ে যায়।

প্রাথমিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের পেছনেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব আছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সাফল্য না আসায় জাতিসংঘ নীতি পরিবর্তন করে। পরিবর্তিত নীতিতে উন্নয়নের জন্য একত্রিত 'unified' ও সমন্বিত 'integrated' বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়। বলা হয় যে উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়। উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচে বলা হয় যে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত হবে, ইউনিয়ন পর্যায়ে সংহত করা হবে এবং থানা পর্যায়ে সমন্বিত হবে। ১৯৬৫-৭০ পর্যন্ত সময়কালে এই উদ্দেশ্য বহু সরকারী কর্মকর্তা, গণ প্রতিনিধি ও সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ ভূমির ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বৈচিত্র (crop

diversification) আনা। এই উদ্দেশ্যে থানা পর্যায়ে TCCA থেকে ঋণ, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচীতে ভূমিহীনদের সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

কুমিল্লা এ্যাপ্রোচের ন্যায় IRDP এর ফলাফলও একই রকম হয়।

- এতে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য অতিমাত্রায় বেড়ে যায়।
- ধনী কৃষকগণ অধিক হারে কৃষিঋণ পায় ও ঋণ খেলাপী হয়।
- ধনী কৃষকগণ সমবায় সংগঠনে কম অর্থ সঞ্চয় করে।
- ধনী কৃষকগণ ঋণ নিয়ে ফেরত না দেয়ায় মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণের ঋণ পেতে অসুবিধা হয়।
- মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন কিন্তু যথা সময়ে ঋণ পান না।
- ভূমিহীনদের সমবায়ে অন্তর্ভুক্তির কথা থাকলেও কার্যত ভূমিহীন সদস্যগণের সংখ্যা ৫% এর মত ছিল।
- সমবায়ের পুরো কাঠামো গ্রামীণ এলিটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের সঙ্গে যোগসাজশ তৈরী হয় শহরের ধনী শ্রেণীর।
- সর্বোপরি সমবায় ও 'সবুজ বিপ্লব'এর নতুন প্রযুক্তি গ্রাম পর্যায়ে ধনী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)

১৯৮২ সালে IRDP প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে স্বায়ত্বশাসিত বোর্ড হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। পূর্ববর্তী পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সুবিধা থেকে দরিদ্র শ্রেণী বঞ্চিত হওয়ায় BRDB নতুন দুইটি সমবায় সমিতি গঠন করে। এক. ভূমিহীন সমবায় সমিতি ও দুই. মহিলা সমবায় সমিতি। নারী ও পুরুষের জন্য পৃথকভাবে সংগঠন করা হয়। ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি, যার ০.৫ একরের অধিক জমি নেই এবং শ্রম বিক্রয় ব্যতীত যার অন্য কোন উপার্জনের উপায় নেই, কেবল তারাই এসব সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। এসব সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন ম্যানেজার ও ছয়জন পর্যন্ত পরিচালক থাকেন। সমিতির প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে কমপক্ষে এক টাকা সঞ্চয় করেন এবং একটি শেয়ার ক্রয় করেন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বর্ণনা করে সমবায় থেকে সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের পরিমাণ সদস্যের সঞ্চিত অর্থ ও শেয়ারের বিশ গুণ অর্থ। এসব সমবায় সমিতিকে সরকার মৎস্য চাষের জন্য পুকুর বরাদ্দ করে থাকে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে আছে বাঁশ ও বেতের কাজ, হিসাব সংরক্ষণ, ভোজ্যতেল উৎপাদন, ছাগল ও গরুর খামার, হাঁস-মুরগী চাষ, জাল তৈরী ও রিক্সা ক্রয়।

পল- ীউন্নয়ন বোর্ড ভূমিহীন ও নারীদের সমবায় গঠনের উপর জোর দেয় কিন্তু ভূমিহীনদের নামে ধনী কৃষকদের লাভবান হওয়ার

পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের প্রধান সমালোচনা এই যে, ভূমিহীনদের শনাক্ত করার জন্য কোন জরীপ করা হয় না। সুতরাং ভূমিহীনের নামে ধনী কৃষকদের লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। সমিতি গুলি ভূমিহীনদের সংগঠন হলেও এগুলি থানা পর্যায়ের TCCA এর সঙ্গে সমন্বিত। থানা পর্যায়ের TCCA তে ধনী কৃষকদের আধিপত্য থাকায় কার্যত ভূমিহীন দরিদ্রদের কাছে সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সমিতিগুলি দরিদ্র কৃষকদের অ-কৃষি কর্মসংস্থানের জন্য সংগঠিত করার কথা থাকলেও কার্যত তা হয় না। কারণ BRDB এর কর্মকর্তাগণের চিন্তাভাবনায় কৃষি কার্যক্রমের প্রভাব বেশি। লক্ষণীয় যে সমবায় বিভাগ ও বেসরকারী সংস্থা গ্রাম পর্যায়ে সহজ শর্তে ঋণ দেয় কিন্তু সে স্থলে BRDB এর শর্ত ততটা সহজ নয়। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে অনেক সময় সময়মত কৃষি উপকরণ পৌঁছায় না। একারণে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালী কৃষকগণ প্রকারান্তরে BRDB থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। এটি সম্ভব হয় কারণ BRDB কর্মকর্তাগণ পক্ষপাতমুক্ত নন। BRDB এর অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প আছে। এই প্রকল্পের অধীনে সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ, হ্যাচারী নির্মাণ, থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, গুদাম নির্মাণ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাসগৃহ নির্মাণ ইত্যাদি নির্মাণ কাজ হয়ে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য থেকে এইসব

নির্মাণ কাজের জন্য অর্থের যোগান হয়। বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। এইসব নির্মাণ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান করা ও উন্নয়নে সহযোগিতা করা। কিন্তু জানা যায় যে এইসব প্রজেক্টের কাজ BRDB সমবায় করলেও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়। জানা যায় যে ১.৩ বিলিয়ন টাকা প্রজেক্টে ব্যয় হলেও মাত্র ৩% - ৪% অর্থ দরিদ্রদের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে (মমিন, ১৯৯২)।[১]

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অসারতা নিয়ে মাহবুবুল হক (১৯৭৬)[২] নানা ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও পাকিস্তানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি লিখেছেন তবু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তিনি সাত ধরনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন :

এক, উন্নয়নের ক্ষেত্রে মডেলের উপর গুরুত্ব বেশী থাকে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও প্রজেক্ট মূল্যায়নের উপর নয়।
দুই, সরাসরি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর মনোনিবেশ করা হয়।
তিন, অধিক বিনিয়োগের উপর বিশ্বাস থাকে।
চার, উন্নয়নের 'ফ্যাশন' এর প্রতি আকর্ষণ থাকে।
পাঁচ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দুটি দুই মেরুতে অবস্থান করে।
ছয়, মানব সম্পদ উন্নয়নকে অবহেলা করা হয়।
সাত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর আলোকপাত করা হয় এবং ন্যায় বিচারের প্রশ্ন হারিয়ে যায়।

সারাংশ

এটা সহজবোধ্য যে গ্রামে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে সকল মানুষের জন্য বন্টন যোগ্য দ্রব্যই কম থাকবে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বা মাথাপিছু উৎপাদন বেড়ে গেলে তার ফলে অবধারিতভাবে গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় না। কারণ বৈষম্যমূলক গ্রামীণ সমাজে অধিক উৎপাদন আপেক্ষিক দারিদ্র বৃদ্ধি করে। উৎপাদনের কতটুকু অংশ কারা আত্মসাৎ করছে তা দিয়ে আপেক্ষিক দারিদ্র বোঝা যায়। উৎপাদনের সুষম বণ্টন ছাড়াও নিম্নবিত্তদের দারিদ্র কমানোর জন্য প্রয়োজন মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এছাড়া প্রয়োজন ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সে অবস্থায় উৎপাদনের উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগ করতে থাকলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোর দিকে যায়। বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজি বৃদ্ধি পেলে ও উদ্বৃত্ত পুনরোৎপাদন হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে কেবল প্রত্যক্ষ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

---

[১] Momin M A, *Rural Poverty and Agranian Structure in Bangladesh*, Vikas Publishing, New Delhi, 1992.

[২] Haq Mahbubul, *The Poverty Curtain : Choices for the Third World*, Colombia University Press, 1976.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Closed Clubs of Kulaks কি?
- ক. দরিদ্র কৃষকদের সংগঠন
- খ. পল্লী উন্নয়নের সরকারী প্রতিষ্ঠান
- গ. মহিলা সমবায় সমিতি
- ঘ. ধনী কৃষকগণ কর্তৃক সমবায় সমিতি দখল

২। সবুজ বিপ্লব কি?
- ক. দরিদ্র কৃষকদের আন্দোলন
- খ. সমবায় সমিতি
- গ. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি
- ঘ. সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন

৩। BARD এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
- ক. মাহবুবুল আলম চাষী
- খ. ড. আখতার হামিদ খান
- গ. মাহবুবুল হক
- ঘ. পাকিস্তান সরকার

৪। সবমায় সমিতির ঋণ গ্রহণ করে কারা ঋণ খেলাপী হন?
- ক. ক্ষুদ্র কৃষক
- খ. মাঝারী কৃষক
- গ. ধনী কৃষক
- ঘ. প্রান্তিক কৃষক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ কি?

২। IRDP ও BRDB এর মধ্যে পার্থক্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কুমিল্লা এ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে কি ধরনের কর্মসূচী গৃহীত হয়? আলোচনা করুন।

২। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণ কি? পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

পল্লী উন্নয়নে সরকারী পরিকল্পনা
Government Planning for Rural Development

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কৌশল
- গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচী ও দরিদ্রের কর্মসংস্থান
- সরকারের শিল্পনীতি পর্যালোচনা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত - স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। তাছাড়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ও পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি থেকে আসে এবং মোট জনসংখ্যার ৮০% গ্রামে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র এবং সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত। স্বল্প আয়, অশিক্ষা, অসুস্থতা ইত্যাদি তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। সরকারের মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনাকারীগণ এইসব কারণে উন্নয়নের প্রশ্নে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর উল্টো চিত্র পাওয়া যায়। সরকারী মতে এর প্রধান কারণ উন্নয়ন উদ্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অভাব এবং বিত্তবানদের আধিপত্যের সামনে তাদের ক্ষমতাহীনতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ বিত্তবানরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা কাঠামো আরো শক্ত করেন। অন্য দিকে তারা সরকারের ক্ষমতাশালীদের জন্য সমর্থনের বুনিয়াদ তৈরী করেন। সরকারী পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রণীত পাঁচটি পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো।

সরকারের পল ী উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে গ্রামীণ বিত্তবানগণ তাদের ক্ষমতা কাঠামো আরো শক্ত করেন এবং শাসকগোষ্ঠীর জন্য তারা সমর্থনের বুনিয়াদ তৈরী করেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

উৎপাদনের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ; স্থানীয় সংগঠনে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; সমবায় সংগঠন; ধনসম্পদ ব্যবহার ও স্বনির্ভর অর্থনীতি; বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কাঠামো গঠন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন; বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচীর সমন্বয়; স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী; সারাদেশে একই ধরনের সমবায় সমিতি গঠন; গ্রামে লক্ষ্যদল ভিত্তিক সংগঠন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কার; মহকুমাকে জেলায় ও থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ; নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা; পল্লী উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে অধিক বরাদ্দ; পল্লী বিদ্যুৎ; ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ; ভূমি সংস্কার; অ-কৃষি খাতে কর্মসংস্থান; সহজ শর্তে পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ; গ্রামীন শিল্প উন্নয়ন; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি; গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন; প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়ন; সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; ভৌত অবকাঠামো- বাজার ও রাস্তাঘাট উন্নয়ন; মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০০০)

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণ ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; অংশগ্রহণ মূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন; নীচ থেকে উপরে (bottom - up) পরিকল্পনা; গ্রাম পরিষদ গঠন ও অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; মানব সম্পদ উন্নয়ন; গ্রামীণ দরিদ্র ও নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি; গ্রামীণ শিল্পায়ন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন।

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী (Rural Works Programme)

সরকারের পল্লী পূর্ত কর্মসূচী স্বল্পমেয়াদে দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে ।

সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী হচ্ছে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। দারিদ্র বিমোচনের জন্য এটি কার্যকর বলে ধরা হয়। তবে এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। দরিদ্রদের জন্য এই কর্মসূচী স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়। দীর্ঘ মেয়াদেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর। কারণ রাস্তা ঘাট, বাঁধ, বাজার, পুকুর সংস্কার, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের পর এসকলকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। সামাজিক অবকাঠামো যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের ফলেও সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার কথা। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী দারিদ্র নিরসনের মধ্য দিয়ে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে এনে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে বলেও ধারণা করা হয়। কিন্তু এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। নির্মাণ কাজে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হওয়ার ফলে দরিদ্রদের আয় রোজগারের ব্যবস্থা হওয়ায় দারিদ্র কিছুটা কমে। নির্মিত অবকাঠামো থেকে সুবিধা পাওয়া নির্ভর করে দরিদ্ররা এসব অবকাঠামো কতটা ব্যবহার করে নিজের সুবিধা অর্জন করতে পারেন তার উপর। দেখা যায় যে এসব অবকাঠামোর অনেকগুণ বেশি লাভজনক ব্যবহার করতে পারেন সম্পদশালীগণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব অবকাঠামো সুফল বয়ে আনে। যাদের জমি নেই তাদের জন্য এক্ষেত্রে সুফল নেই। তবে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্পদশালীগণ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন অবকাঠামো ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে আরো কাজ সৃষ্টি হলে দরিদ্রগণের কর্মসংস্থান ঘটে।

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী শুরুতে শ্রমিকদের অর্থ দিয়ে মজুরী প্রদান করতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর মজুর হিসেবে গম প্রদান করা হয়। বাজার দরের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী দেবার বিধান থাকলেও দেখা যায় যে বাজার দর থেকে মজুরী হিসেবে কম খাদ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বলা হয় যে এটি করা হয় অত্যন্ত দরিদ্রদের এই প্রজেক্টের কাজে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে। প্রজেক্টের উদ্দেশ্য অনুসারে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে যখন শ্রমিকরা আবহাওয়ার কারণে বেকার থাকতে বাধ্য হন তখন এই কাজ সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু কার্যত অনেক সময় শুকনা মৌসুমে প্রজেক্টের কাজ চলে। কৃষি কাজে যখন কর্মসংস্থান নেই তখন শোচনীয় দারিদ্রের অবস্থা তৈরী হয়। সে সময় পল্লী পূর্ত প্রজেক্টের কর্মসংস্থান হলে দরিদ্রদের জন্য বিরাট সাহায্য হয়। অবকাঠামো তৈরী হওয়ার ফলে ধনী কৃষকগণ উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তিতে চাষ করতে সক্ষম হন। এই প্রযুক্তি শ্রমঘন বলে কৃষিকাজেও ক্ষেতমজুরদের কাজ বৃদ্ধি পায়। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর দরিদ্রদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কমার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা আছে। কিন্তু সার্বিক কর্ম চাহিদার তুলনায় এই কর্মসূচীতে সৃষ্ট কাজের সরবরাহ যথেষ্ট নয়।

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী গ্রামের বিত্তবানদের কেবল অর্থনৈতিক সুবিধাই প্রদান করে না তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এইসব প্রজেক্ট কারা পরিচালনা করেন। প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন গ্রামের এলিট, বিত্তবান ভূমি মালিক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত একই শ্রেণীভুক্ত লোকজন। প্রজেক্ট বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিহীন দরিদ্রদের কোন সুযোগ নেই। প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে বিত্তবানদের যে স্বার্থগোষ্ঠী তৈরী হয় তারা প্রজেক্টের গম আত্মসাৎ করেন। তারাই সিদ্ধান্ত নেন কোন এলাকায় কি ধরনের উন্নয়ন কাজ হবে, কতদিন কাজ চলবে, মজুরীর হার কি হবে, কোন শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ দেয়া হবে সব কিছু। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর অধিকাংশ অর্থ সরকারী আমলা, স্থানীয় নেতৃবর্গ, কন্ট্রাক্টর, শ্রমিক সর্দার ভাগ বাটোয়ারা করে আত্মসাৎ করেন। ফলে নির্মাণ কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় না ও কাজের মান খারাপ হয়। এইসব নির্মাণ কাজের অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসে যা নির্মাণের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়, রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নয়। ফলে দু র্বল নির্মাণ সহজেই ভেঙ্গে গেলেও তা পুন:নির্মাণের সুযোগ থাকে না। দেখা যায় যে অনেক প্রজেক্টের কাজ অসমাপ্ত পড়ে থাকে। এভাবে প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। তবে গ্রামীণ বিত্তবানদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে এই কর্মসূচীর সহায়ক ভূমিকা আছে। গ্রামীণ ক্ষমতাশালীদের হাত আরো শক্তিশালী হওয়ায় জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতাবানদের সঙ্গে তাদের আঁতাত আরো সুদৃঢ় হয়।

পল ী পূর্ত কর্মসূচীর প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে বিত্তবানদের স্বার্থগোষ্ঠী তৈরী হয় এবং তারা গম আত্মসাৎ করেন।

শিল্পনীতি

বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য কর্মসংস্থান করা। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পের উন্নয়নও সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটানোরও প্রচেষ্টা আছে। এই সংস্থা গ্রাম পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ এবং পণ্য বাজারজাত করণেও সংস্থার ভূমিকা আছে। এই সংস্থার কার্যক্রম জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হয় যে শিল্প সংগঠনে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। সে স্থলে কুটির শিল্প ক্ষুদ্র পরিসরে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সংস্থার সাফল্য ভাল নয়। তাঁত বোর্ড এবং রেশম বোর্ড ভালোভাবে সংগঠন করা যায় নি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ কম। এ ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগও নগণ্য। বৃহৎ শিল্পে ব্যাংক ও ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বৃহৎ অংকের অর্থ ঋণ প্রদান করে এবং সে ক্ষেত্রে খেলাপীর সংখ্যাও কম নয়। অথচ ক্ষুদ্র শিল্পে স্বল্প পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করে দারিদ্র সংকোচন করা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকহারে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠলে মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সম্ভাবনা আছে। কুটির শিল্প বিকাশ করে গ্রামীণ নারীদের পরিবারিক পরিবেশে কর্মসংস্থান হতে পারে। নিত্য ব্যবহার্য বহু পণ্য সরকার আমদানী করে যা ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন প্লাষ্টিক দ্রব্য, খেলনা, বোতাম, পেন্সিল, সূচ, পিন, তালা, ছোট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বাধিক সম্ভাবনা কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে। এভাবে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকে যুক্ত করে সারাদেশে শিল্পকারখানা ছড়িয়ে দিলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে সম্পদের সুষম বন্টন হওয়া সম্ভব। ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থাপনাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হলেও, এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ কম।

লক্ষণীয় যে বৃহদায়ন শিল্প স্থাপন ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প বিকাশে বড় অন্তরায়। অধিক জনসংখ্যার এই দেশে সরকারের পরিকল্পনা কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দেয় কিন্তু শ্রমঘন ক্ষুদ্রশিল্প বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। বরং লক্ষণীয় যে বৃহৎশিল্প ও নতুন প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্প বিলুপ্তির উপক্রম হয়। নিম্নের দুটি কেস স্টাডি থেকে আপনারা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের অসম প্রতিযোগিতা ও গ্রামের দরিদ্র নারী পুরুষের কর্মহীন হওয়ার বিষয় জানতে পারবেন।

কেস স্টাডি : ১

চিনি শিল্প ও গুড় নিয়ন্ত্রণ

আখের উৎপাদন এবং আখ চাষের জমি কমে যাবার কারণ হচ্ছে আখচাষীদের সঙ্গে সরকারী নীতির বিরোধ। এ বিরোধের উৎস হচ্ছে গুড় নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি চিনি কলের চারদিকে চিনি কলের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট এলাকা চিনি কল অধীন এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ এলাকায় আখ থেকে গুড় উৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আখ চাষীরা এই আখ চিনি কলগুলিতে তাদের নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে আখের দাম নির্ধারণ করে ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। এর বিকল্পের সুযোগ নেই কৃষকদের জন্য। এ অবস্থার সুযোগ নেয় ফড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগী। চিনি কল গুলির কাছে বর্তমান নিয়মের অধীনে আখ চাষীরা আখ বিক্রয় করতে মোটেই আগ্রহী নয়। তার কারণ অনেক।

আখ উৎপাদন এবং আখ চাষের জমি কমে যাবার কারণ হচেছ আখচাষীদের সঙ্গে সরকারী নীতির বিরোধ। দরিদ্র কৃষক চিনির কলে ন্যায্য মূল্যে সময় মত আখ বিক্রয় করতে পারেন না। তাই তাদের জন্য গুড় উৎপাদন লাভজনক। কিন্তু চিনির কল এলাকায় গুড় উৎপাদন নিষিদ্ধ।

প্রথম সঙ্কট সৃষ্টি হয় পারমিট বা পুঁজি নিয়ে। একটি অনুমোদিত পুঁজি (পারমিট) কমিটি প্রতি আখচাষীকে একটি পুঁজি দেয়। এই কমিটিতে থাকেন মিলের একজন প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। চিনি কল এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক কখনো সময়মতো পুঁজি পায় না। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যক পুঁজি নিয়ে নেন এবং তাদের দলের টাউটদের দেন। দরিদ্র ও মাঝারি কৃষক পুর্জির জন্য অপেক্ষা করতে করতে কালোবাজারীতে টাউটদের কাছ থেকে পুঁজি কেনেন। অথবা আখ ক্ষেতেই শুকিয়ে যায় ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র আখ চাষীরা মিলের আখ ক্রয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না। জমির আখ আগেই বিক্রয় করে দেন পানির দামে। চিনিকল নির্ধারিত সময়ে না চলবার দরুণ ও পুঁজি পেতে দেরী হবার দরুণ আখের ওজন কমে যায়। এসব অনিশ্চয়তা ছাড়াও সকল খরচ মিলিয়ে মন প্রতি আখের উৎপাদন খরচ পড়ে ১৫ টাকা। অথচ মিল ক্রয় করে মন প্রতি ১২ টাকা দরে।

এরকম অসহায় অবস্থায় আখ চাষীরা গুড় উৎপাদনে বেশী উৎসাহী হন। গুড় উৎপাদনে লাভজনক দিক অনেক। প্রতি মন আখ থেকে উৎপন্ন গুড় বিক্রয় করে ২০-২৫ টাকা লাভ পাওয়া যায়। নিজেদের আখ মাড়াই কল থাকলে আরো লাভজনক হয়। কিন্তু মাড়াই কলের দাম ৩/৪ হাজার টাকা বলে অনেকে কিনতে পারেন না। দেশীয় প্রযুক্তির আখ মাড়াই কল ব্যবহারে ৯০% রস গুড়ে পরিণত করা সম্ভব। অন্য কলে ৫৫% রস গুড় করা যায়। এই দেশীয় আখ মাড়াই কল তৈরী করা যায় না সরকারী নীতির কারণে। সারা দেশে গুড়ের চাহিদা বেশি। গুড় শিল্প বিকাশযোগ্য একটি শিল্প। কিন্তু সরকারী নীতির কারণে গুড় শিল্প ধ্বংস হচ্ছে এবং এতে দরিদ্র শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গুড় উৎপাদনে বাধা দিয়ে কৃষকের ফসলের উপর মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। গুড় উৎপাদনে বাধা দিয়ে আখ কেনা হচ্ছে অত্যন্ত কম দামে। অন্য দিকে যারা পুঁজি বিতরণ করেন, আখ ক্রয়ে কারচুপি করেন সেইসব গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানরত ব্যক্তি ও স্থানীয় প্রশাসনিক আইন রক্ষাকারীরা বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন।

আখ চাষীদের শারিরীকভাবে নির্যাতন করা হয় আখ বিক্রয়ের জন্য। কিন্তু পুঁজি সংগ্রহ করতে না পারায় দরিদ্র কৃষক আখ বিক্রয় করতে পারেন না। আখ ক্ষেতে শুকিয়ে যায়। এদেশে নীল চাষের প্রচলন ছিল। কৃষকদের বাধ্য করতো বৃটিশ শাসকরা নীল উৎপাদন করতে। না করলে মারধর করা হতো। আখ চাষীদের অবস্থাও সেরকম।

উৎস : আনু মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

কেস স্টাডি : ২

আধুনিক প্রযুক্তি নারী শ্রম চ্যুতিমূলক প্রযুক্তি

গ্রামাঞ্চলের নারীরা তুষ নিষ্কাশনে চিরাচরিত প্রথায় ঢেঁকি ব্যবহার করে থাকেন। স্বল্প ব্যয়ে প্রক্রিয়াজাত করণের এই দেশজ পদ্ধতি শ্রমঘন। এই প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামীণ দরিদ্র নারীর কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। কেবল ঢেঁকিতে তুষ নিষ্কাশনই নয় এর পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া যথা ধান সিদ্ধকরণ, শুকানো, উড়ানো সব কাজ নারীরাই করে থাকেন। ধান প্রক্রিয়াজাতকরণে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করায় নারীর কর্মসংস্থানের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। গ্রামীণ নারীরা দ্রুত অর্থকরী কর্মকাণ্ড থেকে অপসারিত হচ্ছেন। একটি মিল ৩০০ জন নারীকে অপসারিত করতে সক্ষম। কাষ্টম মিলের সংখ্যা যদি বৎসরে ৫% হারে বৃদ্ধি পায় তবে প্রতি বৎসর কমপক্ষে এক লক্ষ নারীর কর্মচ্যুতি ঘটবে। স্বয়ংক্রিয় ধানের কলগুলি অল্পসময়ে তুষ নিষ্কাশন ও অন্যান্য কাজ করতে সক্ষম। একটি স্বয়ংক্রিয় ধানের কল ৯০০ জন খণ্ডকালীন ও ৬৪ জন পূর্ণকালীন কর্মে নিয়োজিত নারীকে কর্মচ্যুত করতে সক্ষম। ধানের কলের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে কর্মচ্যুত গ্রামীণ নারীদের অধিকাংশ বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি অথবা ধনী কৃষকের বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ নারীদের জন্য ঢেঁকি ব্যবহারের ব্যবস্থা হলে ফসল কাটার মৌসুমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। এতে দরিদ্র পরিবার গুলির আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

যন্ত্র চালিত চালের কলের জন্য ঢেঁকি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নারীরা কর্মচ্যুত হচ্ছেন।

ঢেঁকিতে তুষ নিষ্কাশনের ব্যয়ের চেয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যয় অনেক কম পড়ে। সুতরাং ধানের কলে বিনিয়োগে মুনাফার হার বেশী হয়। এ কারণে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির মালিকগণ আগ্রহী হয়ে উঠেন। স্বল্পমূল্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় মুনাফার হার অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গ্রামের কোন শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হচ্ছে? ক্ষুদ্র কৃষক? ভূমিহীন কৃষক? দরিদ্র পরিবারের অভাবগ্রস্ত নারী? যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে দুই শ্রেণীর মানুষের আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক, ধানের কলের মালিক ও দুই, উদ্বৃত্ত কৃষক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ফসল তোলার মৌসুমে উদ্বৃত্ত কৃষকদের গৃহে মজুরীর বিনিময়ে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করেন। ব্যক্তিগতভাবে বা কয়েকজন মিলে ধান কিনে ঢেঁকিতে ছাঁটাই করে বাজারে বিক্রয় করেন। ফসল তোলার মৌসুমে যদি নারীরা ঢেঁকিতে মোট উৎপাদিত ধানের সম্পূর্ণ অংশই প্রক্রিয়াজাত করেন তবে তাদের জন্য ২.৭ মিলিয়ন নারী শ্রমবর্ষের সৃষ্টি করা সম্ভব। দারিদ্র নিরসন এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন দেশজ ঢেঁকি প্রযুক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় হওয়া স্বাভাবিক।

ধান প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তিতে পুঁজির প্রাধান্য ঢেঁকির তুলনায় ৯৫ গুণ বেশী। ঢেঁকিতে ছাঁটাই করলে ধান থেকে চাল প্রাপ্তির হার দাঁড়ায় ৭২.০২%। অন্য দিকে যন্ত্রে ধান থেকে চাল প্রাপ্তির হার ৬৯.৯৪%। ভাঙ্গা চালের পরিমাণ যন্ত্রে ছাঁটাইকৃত চালে বেশি। মিলে ধান থেকে চাল প্রাপ্তির পরিমাণ প্রতিমণ ২৫.৩ সের। ঢেঁকিতে ছাঁটাইকৃত চাল প্রাপ্তির পরিমাণ প্রতি মনে ২৮ থেকে ২৯ সের। যন্ত্রের ব্যবহারে চালের উপরিভাগের বি-ভিটামিনযুক্ত লাল আবরণটি নষ্ট হয়ে যায় ও চালের খাদ্যমান কমে যায়। ঢেঁকি ছাঁটা চাল অধিক পুষ্টিকর।

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য অর্থকরী কর্মের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন। ধান প্রক্রিয়াজাত করণের মত প্রযুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সরকারের উল্লেখিত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের মত বিপুল জনসংখ্যার ও উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশে পুঁজি প্রধান ও জাতীয় লক্ষ্যের পরিপন্থী প্রযুক্তি প্রয়োগ করা অবিবেচনা প্রসূত। বহুল ব্যবহৃত শ্রমঘন দেশীয় প্রযুক্তি ঢেঁকির উন্নয়ন সাধন গ্রামীণ দারিদ্র নিরসনে ও নারীর কর্মসংস্থানে অধিক ফলপ্রসূ।

উৎস : খালেদা সালাহউদ্দিন, "ধান প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপর প্রতিক্রিয়া", লতিফা আকন্দ ও রওশন জাহান সম্পাদিত, *Women for Women Collected Articles*, Women for Women, Dhaka, 1983.

সারাংশ

যদিও গ্রাম ভৌগোলিক অর্থে ক্ষুদ্রতম এলাকা যেখানে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত হওয়ার কথা, সেখানে সরকারের কার্যকর উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি করা যায় নি। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে থাকলেও এগুলি গ্রামের দরিদ্রদের কাছে পৌঁছাতে না পেরে দূরবর্তী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যত পুঁজির যোগান দেয়া হয় তা চলে যায় ক্ষমতাশালীদের দখলে। এতে কিছুটা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পুনরুৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পায় না। উপরন্তু সরকারী কাঠামোর সহযোগিতায় গ্রামের সুবিধাভোগী একটি শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি হয়। এমতাবস্থায় সরকারী নীতি বিরাজমান অসম সম্পর্কে পরিবর্তন না এনে দারিদ্র বিমোচনের কাগুজে তৎপরতায় পরিণত হয়। আবার দেখা যায় যে সরকারী নীতি এক দিকে কৃষিখাতে কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করছে অন্য দিকে পুঁজিঘন শিল্প নীতি গ্রহণ করে শ্রমিকের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ করছে। অ-কৃষিখাতে কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের নীতি রয়েছে কিন্তু গ্রামীন শিল্পোদ্যোগ প্রচণ্ড ব্যাহত হচ্ছে শ্রমচ্যুতিমূলক ও পুঁজিঘন বৃহৎশিল্পের বিকাশের কারণে। কার্যত দেখা যায় যে সরকারের পল্লী উন্নয়ন মতাদর্শ অস্পষ্ট এবং পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচী দারিদ্র বিমোচন করতে ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। সরকারী পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ কোন দিকে প্রবাহিত হয়?
ক. নীচ থেকে উপরে প্রবাহিত হয়
খ. কোন দিকে প্রবাহিত হয় না
গ. উপর থেকে নীচে প্রবাহিত হয়
ঘ. উপরেই থাকে

২। সরকারের পূর্ত কর্মসূচী কখন বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র কৃষকের জন্য বেশী লাভজনক হয়?
ক. মে থেকে আগষ্ট মাস
খ. ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস
গ. জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস
ঘ. সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস

৩। বৃটিশ শাসকগণ বাংলা অঞ্চলে কিসের চাষ করার জন্য বল প্রয়োগ করে?
ক. আখ চাষ
খ. পাট চাষ
গ. নীল চাষ
ঘ. কফি চাষ

৪। চিনি শিল্প বিকাশের জন্য সরকারের নীতি কি?
ক. দরিদ্র আখ চাষীদের বিশেষ ঋণ প্রদান
খ. চিনির বিকল্প হিসেবে গুড় উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান
গ. আখের মূল্য বৃদ্ধি করা
ঘ. আখ চাষ এলাকায় গুড় উৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী কিভাবে ধনী কৃষকগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আলোচনা করুন।
২। দরিদ্র কৃষকের উপর চিনি ও গুড় শিল্পের প্রভাব কি ধরনের?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উন্নত প্রযুক্তি কিভাবে নারীদের কর্মচ্যুতি ঘটায়? আলোচনা করুন।
২। সরকারের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন।

পাঠ - ৪

পল্লী উন্নয়নে এনজিও মডেল : ব্র্যাক
NGO Model for Rural Development : BRAC

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতা ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওর উদ্দেশ্য
- এনজিওর দারিদ্র বিমোচন টার্গেট গ্রুপ কৌশল
- ব্র্যাক এর সার্বিক উন্নয়ন (holistic) এ্যাপ্রোচ
- ব্র্যাক এর গ্রুপ গঠন কর্মসূচী
- ব্র্যাক এর উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলাফল

রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতা

পূর্বের পাঠে আপনারা জেনেছেন যে ষাটের দশকে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার প্রভাবে। সরকারের পল্লী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন। আপনারা এটাও জেনেছেন যে গ্রামীন রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সম্পত্তি ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রধান বিষয়। সম্পত্তি ও ক্ষমতার অসম বন্টন গ্রামে ক্রমাগত দারিদ্রের বিস্তার ঘটায়। সরকারী কর্মসূচীর ফলে ধনী কৃষকগণ লাভবান হন। কিন্তু গ্রামীণ বিত্তশালীগণ উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনকে নিশ্চল রাখেন।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রান্তসীমার দেশ হিসেবে গড়ে উঠে।

পল্লী উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এই সকল পরস্পর বিরোধিতার সঙ্গে রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতার সম্পর্ক আছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশসহ বাংলাদেশে উন্নয়ন তত্ত্ব (modernization) চাপিয়ে দেয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধি। তার মানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি। উন্নয়নের এই ধারার ফলে বাংলাদেশ পরনির্ভর একটি দেশে পরিণত হয়। বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রান্তসীমার দেশ হিসেবে গড়ে উঠে। আর জনকল্যাণমূলক উন্নয়নের ধারা বিনষ্ট হয়ে যায়। পুঁজিবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি শক্তিশালী ধনিক শ্রেণী বিকাশ লাভ করে। প্রবৃদ্ধির অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সিংহভাগ আসে বৈদেশিক ঋণ হিসেবে। উন্নয়ন হয়ে যায় সাহায্য নির্ভর। ক্রমাগত বৈদেশিক সাহায্য সরবরাহ থাকায় বাংলাদেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার ঝুঁকি নিতে হয় না। বরং এই সাহায্য সরকারকে অধিক সময়কাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে।

বৈদেশিক সাহায্যের অনুপ্রবেশ এত বেশি ঘটে যে দেখা যায় বাংলাদেশের জ্বালানী, প্রাকৃতিক সম্পদ ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতের ৭৫% বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। পরিবহন ও কৃষি খাতেরও ৬০% বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসে। বাংলাদেশের শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ও বিনিয়োগ সংস্থার ঋণ প্রদানের অর্থের অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসে। এসব সংস্থা থেকে ঋণ ব্যক্তি মালিকদের কাছে যায় পুঁজি হিসেবে। বাংলাদেশ হয়ে যায় বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনস্ত একচেটিয়া পুঁজির দেশ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সবুজবিপ্লবের নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজি বিস্তৃত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি, ব্যাংক ঋণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এসবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজি অনেক সক্রিয় হয়ে উঠে। এই বিপুল বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে না। দেখা যায় যে বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ থেকে যে বিপুল অর্থ আসে, তার প্রায় ৭০% ব্যয় হয় বিদেশী পণ্য ক্রয়ের জন্য। বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও ঠিকাদাররা নিয়ে যায় প্রায় ৫%। বিদেশী সাহায্যের তিন চতুর্থাংশ বিদেশীরা নিয়ে যাবার পর এক চতুর্থাংশ বাংলাদেশে ব্যয় হয়। এই এক

চতুর্থাংশের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এই স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে আছে সরকারী আমলা, দালাল, দেশীয় ঠিকাদার ও দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ (রেহমান সোবহান, ১৯৯৮)।[১] এত কিছু ভাগ বাটোয়ারার পর খুব সামান্য অংশ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের খাতে ব্যয় হওয়ার জন্য অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বৈদেশিক সাহায্যের কারণে পরিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের গতিময়তা সৃষ্টি হয় না।

বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতার কারণে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। দাতা দেশ ও সংস্থাগুলি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে বাংলাদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে। পরনির্ভরতার ফলে সবচেয়ে সুবিধা ভোগ করে সরকার ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সুবিধাভোগী শ্রেণী যা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বৈদেশিক সাহায্য খাতে আসা অর্থ বাংলাদেশে আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়। হয় না প্রবৃদ্ধি। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীর অর্থ চলে যায় গ্রামীণ ধনীক শ্রেণীর হাতে। উৎপাদন বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায় দারিদ্র।

উন্নয়ন কর্মসূচী প্রয়োগের ফলে দারিদ্র বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব পুঁজিবাদের কৌশল পরিবর্তিত হয়। সাহায্য সংস্থাগুলি ভীত হয়ে যায় যে এই হারে দারিদ্র বাড়তে থাকলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সঙ্কট তৈরী হয়ে অভ্যুত্থান হতে পারে। আর তা ঘটলে একচেটিয়া পুঁজির বাজার হারাতে হতে পারে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এতকাল সাহায্য ও ঋণ দান করেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য। কারণ স্থিতিশীলতা থাকলে কাঁচামাল সরবরাহ ও বিদেশী তৈরী পণ্যের বাজার নিশ্চিত হবে। চরম দারিদ্রের কারণে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে উন্নত বিশ্বের কাঁচামাল সংগ্রহের ও তৈরী পণ্য বিক্রয়ের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উন্নয়ন কৌশল হিসেবে তাই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয় সমতা সৃষ্টির নীতি। সমতা সৃষ্টির জন্য দরিদ্র শ্রেণীকে চিহ্নিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এভাবে দরিদ্র ভূমিহীন ও দরিদ্র নারী উন্নয়নের নিশানা দল বা target group হিসেবে চিহ্নিত হয়। লক্ষ্যদলের দারিদ্র বিমোচন করে সমতা সৃষ্টির এজেন্ট হিসেবে সরকারের বাইরে অন্য একটি শক্তিকে সৃষ্টি করা হয় যারা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা এনজিও। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা মানে বেসরকারীভাবে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত সংগঠন।

দারিদ্রবিমোচনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব পুঁজিবাদের এজেন্ট হিসেবে সরকারের বাইরে অন্য একটি শক্তিকে সৃষ্টি করা হয় যারা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা এনজিও।

বাংলাদেশে তিন শ্রেণীর এনজিও কর্মরত আছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে বিদেশী এনজিও। এদের অর্থ, নীতি, কর্মপন্থা সবকিছু বিদেশীরা নিয়ন্ত্রণ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে স্থানীয় এনজিও যাদের সম্পদের সিংহভাগ আসে বিদেশ থেকে। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে দেশীয় এনজিও। দেশীয় সম্পদের উপর তারা নির্ভরশীল তবে স্থানীয় বড় এনজিও থেকেও তারা অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এসব সংস্থা বেসরকারী হলেও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। আবার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এদের গঠন, কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রভৃতিতে সাহায্যদাতা সংস্থার প্রভাব আছে।

এনজিওর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের ঘোষণা নিম্নে উপস্থাপিত হলো (এম মোফাজ্জালুল হক, ১৯৯১)।[২]

---

[১] Sobhan Rahman, "Aid Dependence and Policy Ownership : The Tanzanian Experience with Lessons from Bangladesh", *The Journal of Social Studies*, CSS, Nov79, Dhaka University,1978.

[২] *হক মোফাজ্জালুল,"পুঁজিবাদী বিশ্বএনজিওর একটি উপস্থাপনা"*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৩৯, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১।

১। কর্মসূচী হিসেবে গ্রামীণ উন্নয়ন তথা গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান।
২। টার্গেট গ্রুপ হিসেবে গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, ক্ষুদে চাষী ও বেকার মানব গোষ্ঠীকে বেছে নেয়া।
৩। লক্ষ্য হিসেবে ঐ টার্গেট গ্রুপের আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।
৪। উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর পাশাপাশি ধনবৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস এবং তা প্রচলিত উন্নয়ন কাঠামোর মধ্য থেকেই করা।
৫। অর্থ যোগানের সূত্র হিসেবে পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে অতিরিক্ত সাহায্য সরবরাহ করা। তবে 'ওডিএ' এর পাশাপাশি প্রাইভেট ও ভলান্টারি খাতে সাহায্য আগমনের পথ প্রশস্ত করা।
৬। সামাজিক নীতি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ধনী ও দরিদ্রের সহঅবস্থান এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা।
৭। নতুন উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নতুন ধরনের গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি। এর মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্রকে সরাসরি আঘাত করা।
৮। মূল বা সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হিসেবে সামাজিক বিপ্লব কিংবা গৃহযুদ্ধ ও বিশৃ খলা প্রতিহত করা।

ব্র্যাক

উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য 'টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ' গৃহীত হয়।

"বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি" বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সাহায্য সংস্থা যা ব্র্যাক নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৭২ সালে সিলেটের সাল্লায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুর পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ব্র্যাকের কর্মধারায় পরিবর্তন এসেছে। শুরুতে ব্র্যাক 'মানবতাবাদী এ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কর্মসূচী নিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য কাজ শুরু করে। তারপর গৃহীত হয় 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ'। একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে সেখানে কৃষি, সমবায়, হস্তশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে ব্র্যাকের অভিমত হচ্ছে এই যে উন্নয়নের সুফল এলাকার সম্পদশালীদের ভাগে অধিক চলে যায়। এর কারণ হিসেবে ধরা হয় দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অংশগ্রহণ না করে দূরে সরে থাকা। এ পর্যায়ে 'পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ' গৃহীত হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্র শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চলে। দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণকে আরো নিশ্চিত করার জন্য 'টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ' গৃহীত হয়। টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তহীন নারী ও শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীর মানুষকে। টার্গেট আরো সঠিক করার জন্য স্থির করা হয় যে বসতবাড়ীসহ ০.৫০ একর পর্যন্ত ভূমির মালিক ও কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল মানুষ ব্র্যাকের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সার্বিক উন্নয়ন

দরিদ্রদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ব্র্যাক কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশল দুটি - দারিদ্র বিমোচন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন। দারিদ্রকে এ সংস্থা কেবল আয় উপার্জনের অভাব ও কর্মসংস্থানের অভাব হিসেবে দেখে না। অমর্ত্য সেনের (ভারতীয় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী) দারিদ্র বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে তাদের মিল আছে। অমর্ত্য সেনের মতে দারিদ্র কেবল অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে বোঝা যাবে না। কারণ দারিদ্র জীবন ধারণের মান নিরূপণ ও বেঁচে থাকার উপায় নির্ধারণে মানুষের প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা নস্যাত করে দেবার জটিল প্রক্রিয়া তৈরী করে। এই ধরনের ভাবনা থেকে ব্র্যাক দারিদ্র বিমোচনে একটি সার্বিক উন্নয়ন (holistic) এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করে। আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্র্যাক দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠান তৈরী, সচেতনতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় সমাবেশ, শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। দারিদ্রের কারণ হিসেবে ব্র্যাক অনেকগুলি অবস্থাকে চিহ্নিত করে যা তাদের মতে দারিদ্রের পরিবেশ। এই দারিদ্রের পরিবেশের প্রতিকূলতা দূর করে দরিদ্রদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই ব্র্যাক কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। নিম্নের চিত্র থেকে ব্র্যাক চিহ্নিত দারিদ্রের পরিবেশ বোঝা যাবে।

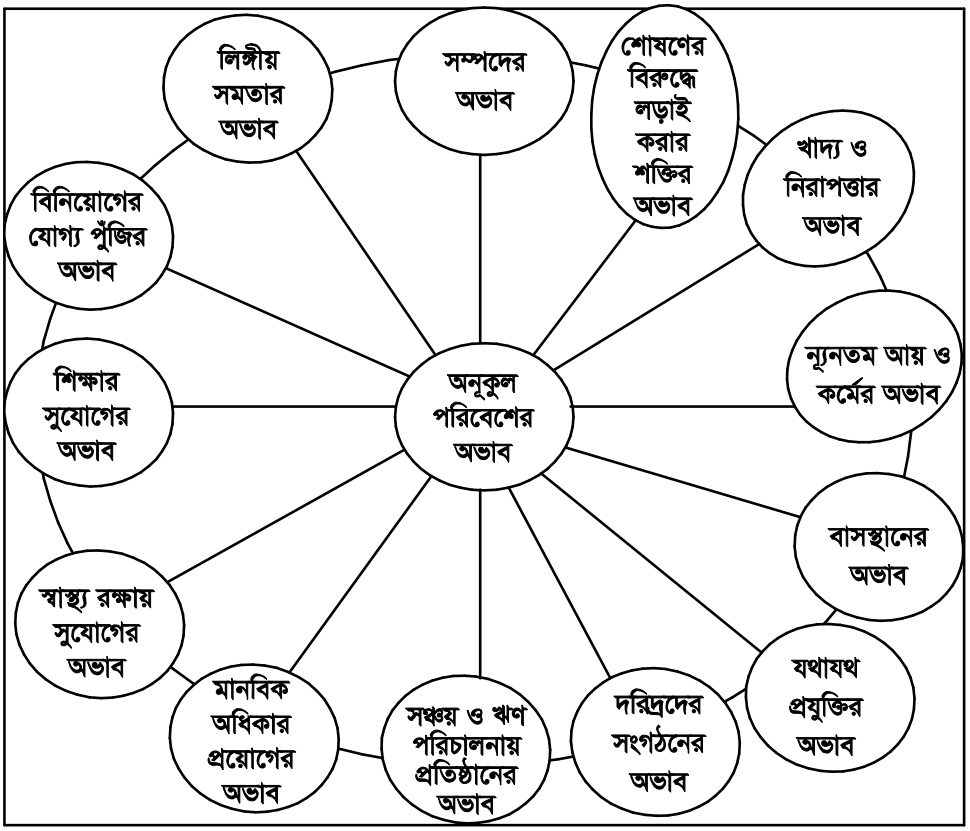

উৎস : Choudhury Moshtaq, "BRAC's Poverty Alleviation Programme : What it is and What is Achieved", in Geoffrey Wood (ed) *Who Needs Credit*, UPL, Dhaka. 1997.

টার্গেট গ্রুপ

টার্গেট গ্রুপের আধিকাংশ সদস্য দরিদ্র নারী। তাদের জন্য ঋণ দান, শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী গৃহীত হয়।

টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণের পরপরই সমমনা ব্যক্তিগণ যাদের অধিকাংশ এই গ্রুপের নারী তারা দল গঠন করেন। সচেতনতা সৃষ্টি ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কার্যক্রম দিয়ে দলের কাজ শুরু হয়। সমাজের অবস্থা কেন নারীদের জন্য নির্যাতনমূলক এবং কিভাবে শোষণমূলক আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বের হওয়া যায় সে সকল বিষয় নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রোগ্রামটি সাজানো। তাছাড়া মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পাঠের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে কমপক্ষে দুই টাকা সঞ্চয় জমা করেন। বলা হয় এই সঞ্চয় সদস্যের বৃদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য। তবে গুরুতর প্রয়োজনে সঞ্চয় থেকে অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব। সদস্যগণকে নানারকম কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সদস্যগণের মধ্যে অনেকে স্বাস্থ্যসেবা বিতরণ ও হাঁস মুরগীর টীকাদান ইত্যাদি কর্মে দক্ষতা অর্জন করেন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে ঋণদান কর্মসূচী। সদস্যপদ লাভের এক মাসের মধ্যে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। তিন ধরনের ঋণের সুযোগ আছে। প্রথমত: প্রথাগত বৃত্তির জন্য যেমন ব্যবসা, পরিবহন (নৌকা বা রিক্সা), ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ (ঢেঁকি) ইত্যাদি। এসব ঋণে সুদের হার ১৫%। দ্বিতীয়ত নারীর জন্য অ-প্রথাগত বৃত্তি যেমন মুদির দোকান, রেষ্টুরেন্ট, হাঁস মুরগীর খামার, সেরিকালচার, যন্ত্রচালিত সেচ ইত্যাদি ঋণের জন্য সুদের হার ১৫%। তৃতীয়ত গৃহনির্মাণের ঋণের জন্য সুদের হার ১০%। ব্র্যাকের মতে ঋণ পরিশোধের হার ৯৮%। দলের অন্যান্য সদস্যগণের চাপ সৃষ্টি ও ব্র্যাক কর্মকর্তাগণের নিয়মিত তদারকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে। ঋণ প্রদান থেকে যে সুদ গ্রহণ করা হয় তা দিয়ে এই কর্মসূচীর ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে।

একটি অঞ্চলে ১০০টি গ্রামে ১৫০টি দল ও প্রায় ৬,০০০ জন সদস্য থাকে। এ ধরনের একটি আঞ্চলিক শাখায় ৯০ লক্ষ টাকার ঋণ কার্যক্রম থাকলে শাখাটিকে স্বনির্ভর শাখা বলা যায়। ব্র্যাকের শাখাগুলির মধ্যে ৩০% এর উর্ধ্বে স্বনির্ভর হয়ে গেছে। ব্র্যাকের সর্বমোট দলের সংখ্যা ৭৫,০০০ ছাড়িয়ে গেছে যাতে সদস্য সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপরে। ব্র্যাকের বিশাল সম্প্রসারণ বোঝা যায় তাদের কর্মকর্তার সংখ্যা দিয়ে। পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মিলিয়ে ব্র্যাকের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮,০০০ এর বেশি। এ পর্যন্ত ৯৬,০০০ মিলিয়ন টাকার অধিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র সদস্যদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকার উর্ধ্বে। বাংলাদেশের সকল গ্রামে ব্র্যাক কার্যক্রম বিস্তারের পরিকল্পনা আছে এবং ৩৫,০০০ গ্রামে ভালোভাবে কার্যক্রম চলছে।

ব্র্যাক এর উন্নয়ন কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণ। ঋণ কার্যক্রমের প্রায় সকল সদস্য নারী। ব্র্যাক পরিচালিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ৭০% শিক্ষার্থী নারী এবং শিক্ষকগণের ৮০% নারী শিক্ষক। স্বাস্থ্য ও হাঁসমুরগী খামার কার্যক্রমের সকলেই নারী। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির হস্তান্তর। এগুলি হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল হাঁসমুরগী পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাসের জন্য হ্যাচারী, কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটা তাজাকরণ, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, তুঁত গাছের চাষ, রেশম গুটি পোকা চাষ ও বুনন। আধুনিক ধরনের চাষের জন্য ব্র্যাক প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যা তিন বৎসর মেয়াদী এবং যা সেইসব কিশোরীদের জন্য পরিচালনা করা হয় যারা নানা কারণে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। চতুর্থত স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ব্র্যাক এক কোটি চল্লিশ লক্ষের চেয়ে অধিক বাড়ীতে ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী ওরাল সেলাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

গ্রাম সংগঠন

ব্র্যাক সংগঠিত গ্রুপের নাম "গ্রাম সংগঠন"। এর মাধ্যমে ব্র্যাক সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। ব্রাক গ্রুপ সদস্যদের একটি গ্রুপ কালচার গড়ে উঠে।

অনুকূল পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের উপর ব্র্যাক গুরুত্ব আরোপ করে এবং সে উদ্দেশ্যেই গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন গ্রুপের সদস্যদের মনস্তাত্বিক অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে গ্রুপের প্রভাব আছে। একই ধরনের স্বার্থ সচেতন ব্যক্তিবর্গ যখন সচেতনভাবে গ্রুপ গঠন করেন তখন গ্রুপ সদস্যদের মনে দলবদ্ধতার মনোভাব গড়ে উঠে। এভাবে ব্যক্তি একাকিত্বের কারাগার থেকে মানসিকভাবে মুক্তি লাভ করে। একাত্মতা গড়ে উঠে বলে সংঘবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধ পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও গ্রুপসদস্যগণ নিরাপত্তা অনুভব করেন। ব্র্যাক সংগঠিত গ্রুপের নাম "গ্রাম সংগঠন" যার মাধ্যমে ব্র্যাক সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। উন্নয়নের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে যারা নির্বাচিত হয় সেসকল পরিবার থেকে একজন সদস্য গ্রাম সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন। সদস্যগণ দশ টাকা জমা দিয়ে গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং প্রতি বৎসর দশ টাকা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করে থাকেন। গ্রাম সংগঠনে ন্যূনতম বিশ এবং উর্ধে পঞ্চাশজন সদস্য থাকেন। নিয়মিত সাপ্তাহিক সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করে ব্র্যাক আয়োজিত সচেতনতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করায় গ্রাম সংগঠনের সদস্যগণের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এই যে (মোস্তফা কামাল পাশা, ১৯৯৩)[৩] সামাজিকভাবে ব্র্যাকের গ্রুপ সদস্যগণ গ্রামের অন্যান্যদের দ্বারা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে যান। ব্র্যাকের প্রোগ্রামে সমাজ পরিবর্তনের জন্য যেসব বিষয় শিক্ষা দান করা হয় যেমন নারী পুরুষের সম মর্যাদা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি গ্রুপ সদস্যদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে যায়। এভাবে ব্র্যাক গ্রুপ সদস্যদের একটি "গ্রুপ কালচার" গড়ে উঠে। সদস্যগণ "ব্র্যাকের

[৩] কামাল পাশা মোস্তফা, *বেসরকারী সাহায্য সংস্থার গ্রুপ গঠন পদ্ধতি ও তৃনমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন : একটি কেস ষ্টাডি*, অপ্রকাশিত মাষ্টারস থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

লোক", "এনজিও এর লোক" হিসেবে 'লেবেল' পেয়ে যান এবং গ্রামীণ সমাজে তারা ভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান।

ব্র্যাক - উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলাফল

ব্র্যাকের অভিভাবকত্বের বাইরে গ্রুপ গুলি একতাবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার প্রান শক্তি পায় না।

ব্র্যাক এর উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে নানাধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ব্র্যাক কি সত্যিকার অর্থে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের কার্যক্রমের আওতায় আনতে পারছে? দেখা যায় যে ব্র্যাক একটি জরীপ করে টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করে। নিয়ম অনুসারে যাদের বাড়ী ও অল্প জমি আছে তারা সদস্য হওয়ার কথা। কিন্তু গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্র্যাক কর্মীদের স্পষ্ট ধারনা থাকে না। তাছাড়া ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকার প্রতি ব্র্যাক কর্মীদের পক্ষপাত কাজ করে। গ্রামীণ এলিটদের প্রভাবের দরুন এমন অনেকে দরিদ্র বলে চিহ্নিত হয়ে যান যারা সত্যিকার দরিদ্র নন। তাছাড়া 'চরম দরিদ্র' বা সর্বহারাদের ব্র্যাকের আওতায় আনার কর্মসূচী নেই। তবে চরম দরিদ্রদের জন্য সরকারের গম বিতরণ কর্মসূচী সমাপ্তির পর ব্র্যাক তাদের জন্য হাঁস মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। মূল প্রশ্ন হচ্ছে ব্র্যাকের গ্রুপগুলি কি গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে সম্মিলিত শক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারে? প্রকৃত সত্য এই যে দরিদ্রগণ ব্র্যাকের গ্রুপ সদস্য হয়ে থাকেন ঋণ পাওয়ার সুযোগের কারণে। সুতরাং তারা ব্র্যাক কর্মীদের সব কথা শোনার চেষ্টা করেন ও অনুগত থাকেন। আর স্থানীয় পর্যায়ে ব্র্যাক কর্মীদের উপর প্রচণ্ড চাপ থাকে স্থানীয় অনুদান ঠিক রাখার জন্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রুপ গঠন করে ঋণ আদান প্রদানের সাফল্য প্রদর্শন করার জন্যই কর্মীগণ অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ব্র্যাক অফিসের কর্মীগণ ব্যস্ত থাকেন বিদেশী অনুদান সংগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য। এই বাস্তবতায় দরিদ্রদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য মূল শক্তি অর্জিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ব্র্যাকের অভিভাবকত্বের বাইরে গ্রুপগুলি একতাবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি পায় না। এসকল কারণে দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন গোষ্ঠির একতাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জোরালো কাঠামো গড়ে উঠার উপায় থাকে না। আনু মোহাম্মদের (১৯৮৩)[৪] পর্যবেক্ষণ এই যে গ্রামাঞ্চলে সনাতনী ও ক্ষমতাশীল মাতব্বর-মোড়লগণ যেভাবে দরিদ্র ও ভূমিহীনদের কোন্দলের মাধ্যমে বিভাজিত করে রাখে সেভাবেই অর্থ যোগানকারী সংস্থাগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে বিভক্ত করে রাখে। বিভিন্ন সংস্থা 'একই' লক্ষ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে একই ধরনের অর্থ যোগানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছড়িয়ে থাকে। সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঐক্যবদ্ধ থাকলে বিভিন্ন এলাকার ভূমিহীনদের একই ফোরামে নিয়ে আসতে পারে। এরকম শ্রেণী চেতনার উত্থান প্রতিহত করার জন্যই এনজিও উন্নয়নের এই ব্যবস্থা। সংগঠনহীন গ্রামের দরিদ্র মানুষকে এনজিওগুলি এভাবেই বহুধা বিভক্ত রেখে শক্তিহীন করে তোলে।

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রুপ গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'টার্গেট গ্রুপগুলির অংশগ্রহণকারী ভূমিকা সৃষ্টি করা। বাস্তবে তা কি হচ্ছে? ব্র্যাক কর্মীগণ গ্রুপের সাপ্তাহিক সভাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। স্থানীয় কর্মীগণ কেবল কেন্দ্রের অনুশাসন মেনে চলেন। এভাবে 'টপ-ডাউন' নীতি বহাল থাকে। এমনকি 'এনজিও ব্যুরোক্রেসি' তৈরী হয় যা সরকারী আমলাতন্ত্র থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

কের বাজার মুখী প্রকল্প য়াদী পুঁজি বিনিয়োগের াধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মরত।

প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, দারিদ্র বিমোচনে এনজিওর ফলাফল কি? Cost of Basic Needs Method অনুসরণ করে আনু মোহাম্মদের (১৯৮৮)[৫] মতামত হচ্ছে, যে হারে এনজিও নেতৃত্বে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে তাতে বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে ১,০০০ বৎসর সময় লাগবে। আনু মোহাম্মদ সাহায্য সংস্থার মূল তহবিলের কত অংশ কোন খাতে ব্যয় হয় তা তুলে ধরেন। যেমন- সাহায্যের ৮০% ব্যয় হয় পরিবহন বাবদ, ১৫% বিদেশী কর্মকর্তা ও উপদেষ্টাদের বাবদ ও ৫% ব্যয় হয় স্থানীয় এনজিও কর্মচারী ও টার্গেট গ্রুপ উন্নয়নে। এই পাঠের শুরুতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরনির্ভরতার আলোচনায় বৈদেশিক সাহায্য ভাগ বাটোয়ারার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল, এনজিও খাতে বৈদেশিক সাহায্যের বন্টন ব্যবস্থা তা থেকে ভিন্ন নয়। এনজিও গুলি যে বাজার অর্থনীতি বিস্তারে ক্রিয়াশীল তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্র্যাকের বাজারমুখী

---

[৪] আনু মোহাম্মদ, *বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৩।

[৫] আনু মোহাম্মদ, *বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*, প্রচিন্তা প্রকাশনী , ঢাকা, ১৯৮৮।

প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মরত। ব্র্যাকের সাত কোটি টাকার কোল্ড স্টোরেজ প্রজেক্ট, পণ্য বিক্রয়ের জন্য আড়ং প্রজেক্ট, ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্র্যাক ক্ষুদ্র পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে বৃহৎ পরিসরে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণে আগ্রহী। ব্র্যাকের প্রচারণায় বলা হয় 'Small is beautiful but large is necessary' । কিন্তু বৃহৎ পর্যায়ের উন্নয়ন কিভাবে গ্রামীণ দরিদ্রদের অবস্থা উন্নয়নে সম্পৃক্ত হবে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

সারাংশ

ত্রিশ বৎসরের অধিক সময়কাল ব্যয় হওয়ার পরও দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি না হওয়ায় ব্র্যাকের উন্নয়ন মডেলের মূল তাত্ত্বিক বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। তাত্ত্বিক ধারণা এই ছিল যে গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হলে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কে প্রভাব পড়বে। এর ফলে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হবে। কিন্তু ব্র্যাক মডেলের বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বদল ঘটে নি। ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিওর উন্নয়ন মডেল ব্যক্তি পর্যায়ে অল্পসংখ্যক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটিয়েছে কিন্তু সার্বিক অর্থে গ্রামীণ দারিদ্র কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণী গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাবলীতে প্রবেশাধিকার না পাওয়া পর্যন্ত সার্বিক দারিদ্রের অবস্থা বদল হওয়া সম্ভব নয়। গ্রামীণ দরিদ্রদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের একটি দুর্ভেদ্য জাল বিস্তৃত হয় ক্ষমতাশালীদের সম্মিলিত প্রয়াসে। এই শোষণকারী চক্র ভেদ করার মত প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিয়ে দরিদ্রদের ক্ষমতাশালী করার উদ্যোগ এনজিও উন্নয়ন মডেলের আওতা বহির্ভূত। এসব কারণে উৎপাদন সম্পর্ক ও ক্ষমতাসম্পর্ক টিকে থাকে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত প্রথম উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ কোনটি?

ক. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ

খ. টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ

গ. মানবতাবাদী এ্যাপ্রোচ

ঘ. পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ

২। 'Small is beautiful but large is necessary' ব্র্যাকের এই শ্লোগানের অর্থ কি?
ক. ব্র্যাক ক্ষুদ্র কৃষককে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু বড় কৃষকের উন্নয়ন চায়
খ. তৃণমূলে কাজ করলেও ব্র্যাক শহর উন্নয়নেও কাজ করতে চায়
গ. দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্র্যাক মুনাফা অর্জন করতে চায়
ঘ. ক্ষুদ্র পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম করে ব্র্যাক সমাজ বিপ্লব করতে চায়

৩। ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম কোন ধরনের?
ক. প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা
খ. মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা
গ. অপ্রাতিষ্ঠানিক বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
ঘ. বয়স্ক শিক্ষা

৪। উন্নয়নের জন্য গঠিত ব্র্যাকের সংগঠনের নাম কি?
ক. নারী উন্নয়ন সংগঠন
খ. ভূমিহীন সংগঠন
গ. গ্রাম সংগঠন
ঘ. কৃষক সংগঠন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতার ধরন কি?
২। নিশানা 'দল' বা টার্গেট গ্রুপ বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দারিদ্র বিমোচনে ব্র্যাক কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে? দরিদ্রদের জন্য অনুকূল পরিবেশ ব্র্যাক কিভাবে সৃষ্টি করতে চায়? আলোচনা করুন।
২। 'ব্র্যাক কর্মসূচী অল্পসংখ্যক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটিয়েছে কিন্তু সার্বিক অর্থে গ্রামীণ দারিদ্র কমাতে ব্যর্থ হয়েছে' - বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ - ৫

ক্ষুদ্র ঋণ মডেল : গ্রামীণ ব্যাংক
Micro Credit Model : Grameen Bank

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- গ্রাম পর্যায়ে ঋণের বিভিন্ন উৎস
- গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী
- দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা

ঋণের উৎস

বাংলাদেশের গ্রামে কৃষি উৎপাদনের জন্য ও বিনিয়োগের জন্য মূলধন সহজলভ্য নয় । অধিকাংশ কৃষক দারিদ্রের জালে আবদ্ধ যাদের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগের উপায় নেই। তাছাড়া দরিদ্র মানুষ অভাবের তাড়নায় জীবন ধারণের ন্যুনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম। মহাজনের সুদের হার অনেক সময় ২০০% কেও ছাড়িয়ে যায় কারণ তারা চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ দেন। গ্রামের অভাবী মানুষ স্বর্ণালঙ্কার, ঘরের আসবাবপত্র ও এক টুকরো জমি বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেন। অধিকাংশ সময় চড়া সুদের টাকা পরিশোধ করতেই ঋণ গ্রহীতা নিঃস্ব হয়ে যান এবং আসল ঋণ বলবৎ থাকে। ফলে বন্ধককৃত দ্রব্যাদি ও জমি উদ্ধার করতে ঋণ গ্রহীতা অপারগ হন। কৃষকদের নিঃস্বকরণের জন্য মহাজনী ঋণ প্রথা বহুলাংশে দায়ী। ধনী কৃষকগণও শোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঋণদান ব্যবসা শুরু করেন। এনজিও ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করায় ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। এ সকল ব্যাংক দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত নয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ করে এবং এই ঋণের অর্থ দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচী চালু করে। তবে জানা যায় যে অনেক ধনী কৃষক ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে সে অর্থ চড়া সুদে ঋণ প্রদানে লগ্নি করেন। অন্য অর্থে ব্যাংকগুলিই প্রকারান্তরে মহাজনী সুদের ব্যবসার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এটি ঘটে প্রথমত এই কারণে যে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ফলে যাদের ভূমি নেই তারা এই ঋণের আওতা বহির্ভূত। দ্বিতীয়ত এই ঋণ গ্রহণের জন্য জামানতের প্রয়োজন আছে। বর্গাদার কৃষক, গ্রামাঞ্চলে যাদের সংখ্যা অনেক, তারা এই ঋণ গ্রহণ করতে অপারগ হন। কারণ বর্গাকৃত জমি জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত ব্যাংক ঋণের সঙ্গে জড়িত আছে ব্যাপক দুর্নীতি। জানা যায় যে ব্যাংক ঋণের সবটুকু অর্থ কখনোই ঋণ গ্রহীতার হাতে পৌঁছায় না। ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থে ভাগ বসায় ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় ক্ষমতাশালী নেতৃবর্গ। চতুর্থত গ্রামীণ ক্ষমতাশালীদের এড়িয়ে স্বাধীনভাবে ব্যাংক ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে গ্রহীতাকে সনাক্ত করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান নির্ভর করেন গ্রামের মাতব্বরদের উপর। ব্যাংক প্রশাসনের এই নিয়মের সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু লোক ভুয়া কৃষক সেজে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সুযোগ নেন। এছাড়া এই দুর্নীতির সুযোগে একই ব্যক্তি ভুয়া কাগজ জমা দিয়ে একাধিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণের অর্থ আত্মসাৎ করেন। অসৎ উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারও হয় না। জানা যায় যে অনেক সময় ঋণের অর্থ সুদের কারবার, ফটকা ব্যবসা ও অপচয়মূলক বিলাসভোগে ব্যয় হয়। ঋণের জন্য আবেদনকারীর পরিচয় সঠিক না হওয়ায় ঋণ পরিশোধের সময় ব্যাংক বিপাকে পড়ে। ঋণ খেলাপীকে ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ততটা তৎপর হতে দেখা যায় না।

একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। ব্যাংকের ঋণ সরবরাহ (delivery) ও পর্যবেক্ষণ (monitoring) বিষয়াবলী ত্রুটিযুক্ত। অন্য দিকে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা জামানত ছাড়া দরিদ্রদের ঋণ প্রদানের জন্য তৈরী নয়। দরিদ্রদের সঙ্গে ব্যাংকের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে গ্রামীণ প্রভাবশালী মহল। দরিদ্র মানুষের বসবাস ও জীবনধারা ও ব্যাংকের কাঠামোগত গঠনের মধ্যে বিশাল ফারাক বিদ্যমান। ব্যাংকগুলি প্রধানত শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ শাখাগুলি পল্লী উন্নয়ন না করে বরং গ্রাম থেকে শহরে সম্পদ নির্গমনে সহযোগিতা করে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম এই চেতনা থেকে যে যথাযথ ঋণের সুবিধা পেলে দরিদ্র শ্রেণীর উৎপাদনশীলতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস। ঋণ প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকসমূহের দুর্বলতা ও দরিদ্রদের কাছে পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সূত্রপাত। গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম এই চেতনা থেকে যে আর্থিক সম্পদের অভাবের দরুন অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ তাদের উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হন। যথাযথ ঋণের সুবিধা পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণীর উৎপাদনশীলতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে, স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র লাঘব হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের টার্গেট গ্রুপ নির্ধারিত হয় ০.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক ও ভূমিহীন শ্রমজীবী বিশেষত দরিদ্র নারী।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ -

১। দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য ব্যাংক সুবিধা বিস্তার।

২। গ্রামের সুদখোর মহাজনের প্রকোপ থেকে দরিদ্রদের রক্ষা করা।

৩। কর্মসংস্থানের অভাবে যে বিপুল সংখ্যক মানব সম্পদ অপচয় হচ্ছে তা রোধ করে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৪। নিম্ন আয়ের ও কর্মহীন মানুষের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা। এ সংগঠন হবে তাদের নিজেদের এবং তারাই এ সংগঠন পরিচালনা করবে। এতে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

৫। পুরাতন দারিদ্রের দুষ্টচক্রের ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। পুরাতন ব্যাখ্যা হচ্ছে "নিম্ন আয়-নিম্ন বিনিয়োগ- নিম্ন আয়"। এর পরিবর্তে নতুন ব্যাখ্যা তৈরী হবে। "নিম্ন আয়- ঋণ - বিনিয়োগ - অধিক আয় - অধিক ঋণ - অধিক বিনিয়োগ - অধিক আয়"।

গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রজেক্ট হিসেবে এটি কার্যক্রম শুরু করে।

ক্ষুদ্র ঋণের উদাহরণ ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও বলিভিয়াতেও আছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছে। প্রধানত গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের সাফল্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এটি দারিদ্র বিমোচনের মডেলে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক কোন এনজিও নয়। কারণ এনজিও দারিদ্র মোচনের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব প্রদান করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে আগ্রহী। সে স্থলে সামাজিক উন্নয়ন গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য নয়। গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রজেক্ট হিসেবে এটি কার্যক্রম শুরু করে। বলা যেতে পারে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিকল্প ব্যাংক ব্যবস্থা বা দরিদ্রদের ব্যাংক। আবার বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের কার্যক্রম থেকে গ্রামীণ ব্যাংক আলাদা ধরনের। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো-

১। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের তুলনায় গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের হার অনেক বেশী- ৯৫% - ৯৯%। এটি সম্ভব হয় ঋণগ্রহীতার ঋণ ব্যবহারের উপর গ্রামীণ ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে।

২। ঋণ গ্রহণের পূর্বে ও পরে ঋণ গ্রহণকারীদের ছোট গ্রুপটিতে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করা হয়। সাপ্তাহিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের বিষয়ে প্রেষণা সৃষ্টি করা হয়।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যক্তি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেস্থলে গ্রামীণ ব্যাংক সমমনা ও একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের গ্রুপ গঠন করে ঋণ প্রদান করে। গ্রুপের পরস্পরের উপর ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে কিংবা একজন ঋণ খেলাপী হলে গ্রুপের সকলকে এর দায় ভার বহন করতে হয়।

৪। ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রুপের সদস্যগণের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পর সদস্যদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের বাজারের বিষয়েও সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকে এসব সুবিধা নেই।

৫। ঋণের পাশাপাশি গ্রুপ সদস্যগণের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করা হয় যাতে সদস্যগণের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠে। এতে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভরশীলতাও কমে।

৬। ঋণ প্রদানের পর গ্রুপ সদস্যগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদানের জন্য পাঁচ জনের গ্রুপ তৈরী করে। গ্রুপের সম্মিলিত দায়বদ্ধতার দরুন ঋণের জন্য জামানতের প্রয়োজন হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর "ঋণ গ্রহীতাই সবচেয়ে ভালো জানে" "(borrowers know best)" নীতিতে বিশ্বাস। যে পাঁচজন ব্যক্তি মিলে গ্রুপ গঠন করেন তারা নিজেরাই সদস্যদের বাছাই করেন। যে পাঁচ জন একত্রে কাজ করতে পারবেন বলে মনে করেন তাদের পারস্পরিক আস্থাই ব্যাংকের জামানতের বিষয়টিকে গৌণ করে দেয়। জামানতের প্রশ্নে সদস্যগণ একজন অপরজনের জন্য এবং একত্রে সকলে ঋণের জন্য জামানতকারী। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার পরিচয়ের সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিষয় এক্ষেত্রে নেই। কারণ গ্রুপের পাঁচজন প্রত্যেকেই পরিচিত। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের মত খরচের পাল্লা ভারি হয় না। তার মানে সম্মিলিত দায়বদ্ধতা তৈরী হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের বাড়তি খরচ গ্রামীণ ব্যাংকের বেলায় প্রযোজ্য হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ হার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। পাঁচজনের গ্রুপটি তারাই তৈরী করেন যারা ঋণগ্রহণের জন্য প্রস্তুত এবং ঋণ ব্যবহার করে কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী। গ্রুপ গঠনের পর গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃতি দানের পূর্বে ব্যাংকের নিয়ম নীতি ও শৃঙ্খলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সদস্যগণের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়। প্রথমে প্রদান করা হয় সাধারণ ঋণ যার পরিমাণ একশত মার্কিন ডলার। গ্রুপের দুইজন সদস্য প্রথম ঋণ পান তাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনার ভিত্তিতে। পঞ্চাশটি কিস্তিতে এবং ১০% সুদ হিসেবে ঋণ পরিশোধ যোগ্য। গ্রুপে যারা ঋণের জন্য অপেক্ষা করেন তারা কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তবুও যদি কোন ঋণগ্রহীতা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে গ্রুপের সকলে মিলে কিস্তি পরিশোধ করেন। সঞ্চয়ের মাধ্যমেও গ্রুপের পাঁচজন একত্রিত থাকার প্রেরণা পেয়ে থাকেন। গ্রুপের একটা সঞ্চয় কার্ড খোলা হয় যেখানে প্রতিটি ঋণের ৫% জমা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে এক টাকা জমা করেন ব্যক্তিগত সঞ্চয় ফাণ্ডে। গ্রুপের সঞ্চয় ফাণ্ড ছয় শত টাকা হয়ে গেলে গ্রুপ গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শেয়ার ক্রয় করে যার মূল্য পাঁচ শত টাকা। প্রতি সদস্য এই শেয়ারের এক শত টাকার অংশীদার। সাধারণ ঋণ প্রদান শেষ হওয়ার পর গ্রুপ সদস্যগণ অন্যান্য ঋণের জন্য আবেদন করেন যার মধ্যে গৃহঋণ, প্রযুক্তি ঋণ, শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ঋণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা গ্রুপ সদস্যগণকে একত্রিত রাখতে সাহায্য করে।

গ্রামীণ ব্যাংক সংগঠনের নিম্ন পর্যায়ে আছে পাঁচজনের গ্রুপ। এধরনের ৫০-৬০টি গ্রুপের তদারকির জন্য আছে একটি ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চে দশজন কর্মকর্তা এলাকার সকল গ্রুপের কাজ তদারকি করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের এই ব্রাঞ্চ গ্রাম এলাকায় স্থাপিত যেখানে দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের বসবাস। এভাবে ব্যাংকের কাছে দরিদ্র মানুষ নয়, দরিদ্রদের কাছে ব্যাংক হাজির হওয়ার নীতি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক তের জন সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত, যার নয় জন সদস্য গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহিতা এবং তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। উল্লেখযোগ্য যে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শেয়ারের ৯২% এর মালিক গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণ এবং বাকী ৮% এর মালিক বাংলাদেশ সরকার। গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থায়নের উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ ও কিছু আন্তর্জাতিক সহায্য সংস্থা প্রদত্ত ঋণ।

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য ক্ষুদ্রঋণ কৌশলের সাফল্যের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রথম সাফল্য এই যে এটি দ্রুত সম্প্রসারণ করতে সমর্থ হয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা একুশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে যাদের ৯৪% দরিদ্র নারী। প্রায় পয়ঁত্রিশ হাজার গ্রামে শাখা বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমানের টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। সদস্যগণের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (হাশেমি ১৯৯৭)।[১] বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সঞ্চয়ের হারের চেয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সঞ্চয়ের হার বেশি। গবেষণায় জানা যায় যে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যগণের অধিকাংশ শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ছোট কারখানা, ব্যবসা, পরিবহন খাতে বিনিয়োগ করে সর্বাধিক লাভবান হয়েছেন। সদস্যগণের আয় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে (হোসেইন, ১৯৮৬)।[২] গ্রামীণ ব্যাংকের নারী সদস্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও অনেক গবেষকের ধারণা।

ক্ষুদ্র ঋণের ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজ কাঠামোর ও ক্ষমতা সম্পর্কের বদল না হলে দারিদ্র সৃষ্টি হওয়ার পথ বন্ধ হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ মডেলটি দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনে "কেবল ক্ষুদ্র ঋণ" বা "Credit only" কৌশল নাকি "ঋণ ও সামাজিক উন্নয়ন" বা "Credit plus" কৌশল অবলম্বন করা হবে। এনজিও পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমালোচনা এই যে দীর্ঘকাল সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার পরও দরিদ্রদের জন্য অনুকূল সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে না। তাছাড়া এনজিওর গ্রুপ সংগঠন গুলিরও টেকসই অবস্থায় উত্তরণ ঘটছে না। অন্য দিকে সামাজিক উন্নয়নকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে কেবল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। এতে আধিপত্যবাদী সামাজিক কাঠামোর থাবা থেকে দরিদ্রদের বেরিয়ে আসার কোন পথ তৈরী হয় না। ক্ষুদ্র ঋণের ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজ কাঠামোর ও ক্ষমতা সম্পর্কের বদল না হলে দারিদ্র সৃষ্টি হওয়ার ও শোষণের পথ রুদ্ধ হয় না। গ্রামীণ ব্যাংকের তদারকীর বিষয়ে সমালোচনা আছে যে ঋণ গ্রহণ থেকে পরিশোধ পর্যন্ত পুরো সময়কাল ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক কর্মকর্তাগণের পুলিশী নজরের মধ্যে থাকেন।

---

[১] Hashemi SM, "*Grameen Bank: A case Study*" in Geoffrey Wood (ed) *Who Needs Credit*? UPL, Dhaka, 1997.

[২] Hossain Mahabub, *Credit for Alleviation of Rural Poverty : The Experience of Grameen Bank : Bangladesh*. Working Paper No . 4, BIDS, Dhaka, 1986.

সারাংশ

গ্রামাঞ্চলে ঋণের চাহিদা অত্যধিক। ঋণের প্রয়োজনের এই বাস্তবতায় মহাজনী প্রথা একটি লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। এইসব মহাজন উচ্চ সুদে টাকা লগ্নি করেন এবং টাকা আদায়ের সময় ঋণ গ্রহীতাকে হয়রানি ও নির্যাতন করেন। ব্যাংক ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ায় মহাজনী ঋণ কিছুটা সঙ্কীর্ণ হয়। তবে ব্যাংকের এই ঋণ দান কর্মসূচীতে লাভবান হন গ্রামের সুবিধাবাদী ধনী শ্রেণী। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের প্রতিবন্ধকতার অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সূত্রপাত ঘটে। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র নারীদের গ্রুপ গঠন করে ঋণ দান করে। এই কর্মসূচীতে যৌথ দায় ও সম্মিলিত দায়িত্ববোধের কৌশলের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম গতিশীল থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের হার অনেক বেশী। কিন্তু সমালোচনা আছে যে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করার জন্য দরিদ্র সদস্যগণকে পুলিশী তদারকীর মধ্যে রাখে। এনজিওর ন্যায় গ্রামীণ ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য গ্রহীতার কাছ থেকে জামানত হিসেবে কি নেয়?
ক. জমির দলিল
খ. স্বর্ণালঙ্কার
গ. পাঁচজনের গ্রুপের সকলে জামানত হিসেবে দায়বদ্ধ থাকে
ঘ. ধনী কৃষক ঋণ গ্রহীতার পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করেন

২। গ্রামীণ ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. সরকারী প্রতিষ্ঠান
খ. একটি এনজিও
গ. একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান
ঘ. একটি বিকল্প ব্যাংক

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে বর্গাদার চাষী কেন ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না?
ক. বর্গাচাষীর ঋণের প্রয়োজন নেই
খ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বর্গাচাষীকে ঋণ প্রদান করেন
গ. ধনী কৃষক চান না যে বর্গাচাষী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করুক
ঘ. ব্যাংকের ঋণের জন্য জমির দলিল জামানত হিসেবে দিতে হয় কিন্তু বর্গাচাষী জমির মালিক নন।

৪। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণ কখন গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শেয়ার ক্রয় করতে পারেন?
ক. সদস্যের ব্যক্তিগত সঞ্চয় এক হাজার টাকা হলে
খ. গ্রামীণ ব্যাংক থেকে দুইবার ঋণ গ্রহণ করলে
গ. পাঁচজনের গ্রুপ গঠনের পর
ঘ. পাঁচজনের গ্রুপের সঞ্চয় ছয়শত টাকা হলে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য কি?
২। গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। "ঋণ গ্রহীতাই সবচেয়ে ভালো জানে" গ্রামীণ ব্যাংকের এই নীতির অর্থ কি? গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়?
২। কেবল ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কি দারিদ্র বিমোচন সম্ভব? গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আলোকে আলোচনা করুন।